এম. আকবর আলী, এম. এস-সি.

—এতে আছে—

দূরবীক্ষণে চাঁদের উপরকার দৃশ্য

আয় আয় চাঁদ মামা,
টিপ দিয়ে যা,
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।

সন্ধ্যার সময় আকাশে যখন চাঁদ উঠে—ঘর-বাড়ী, দরজা-জানালা চাঁদের জ্যোছনায় হাসতে থাকে তখন তোমাদের হয়ত বেশ ভাল লাগে। ছোট ভাইটিকে কোলে নিয়ে মা চাঁদের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন—"আয় আয় চাঁদ মামা"। অমন যে দুরন্ত অশান্ত ছেলে সেও সুন্দর চাঁদকে দেখে থমকে গিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে—তোমাদের মত তারও হয়ত ভাল লাগে—সে দুরন্তপনা ছেড়ে একটুখানি শান্ত হয়। এমন সুন্দর চাঁদের কথা জানতে তোমাদের ইচ্ছা হয় না কি?

চাঁদের মধ্যে গাছের তলায় বসে বুড়ীই তুঁলো দিয়ে সূতো কাটছে, না খরগোসই দৌড়াদৌড়ি করা সুরু করেছে—না কি বুড়ী পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে গেলেও বইয়ের মায়া কাটাতে না পেরে, সেখানেও আবার বই পড়ে পড়ে সারা দিনরাত কাটাচ্ছে—এর একটা মীমাংসা হওয়া নিশ্চয়ই দরকার। তোমরাও হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবে যে, একটা কিছু সুনিশ্চিত-ভাবেই জানা চাই। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জান—এমনি যতই দেখ না কেন, এ যে সত্যিই কি তা কিছুতেই ঠিক করা যাবে না। যতই দেখবে ততই মনে হবে, না এ পাঁজ কাটা বুড়ী না হয়েই যায় না। বই পড়া বুড়ীও হতে পারে, তবে খরগোসও যে না হতে পারে তাও নয়—খরগোসের মত হাত-পা ছোঁড়া—সে রকম মনে হয় বটে। খালি চোখে যখন এমনি অবস্থা তখন একে বাদ দেওয়াই ভাল। সত্যি কথা জানতে হলে বৈজ্ঞানিকের সাহায্য ছাড়া আর উপায় নেই।

চাঁদের মধ্যে সত্যি কি আছে ভাল করে জানতে হবে। একটা জিনিসের কথা ভাল করে জানতে হলে হয় তাকে কাছে আনতে হয় নয় তার কাছে যেতে হয়। চাঁদকে কাছে আনা সম্ভবপর কিনা তোমরাই ভেবে দেখ; সে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। আমাদের পৃথিবীর উপরকার সামান্য একটা গাছপালা আমাদের কথা শুনে না—কাছে আসে না—আর ও ত চাঁদ—"আয় আয়" করে ডাকলে কি হবে—ঠিক যেন

কালা বুড়ী—হাজার ডাকলেও কিছুই শুনতে পায় না। তাই ওকে ডেকে ডুকে কিছুতেই কাছে আনা যাবে না—বরং আমাদেরই যেতে হবে ওর কাছে। যেতে হলে আগে জানা দরকার ওটা কতদূরে আছে—তবে ত সেই অনুসারে তোড়জোড় করতে হবে। তুমি যদি কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম যেতে চাও তা'হলেই তোমার মা কত কি সঙ্গে দেন পথে খাওয়ার জন্যে, কত কি বন্দোবস্ত করেন। দূরের পথ—টাকা-পয়সা চাই জামা-কাপড় চাই—সেখানে যেয়ে খেতে পরতে হবে, থাকতে হবে—আর এ ত চাঁদের দেশে যাওয়ার ব্যাপার; পৃথিবী ছেড়ে কতদূর—অনেক কিছুরই যোগাড় করতে হবে নিশ্চয়ই। তা না হলে চলবে কি করে? যা হোক প্রথমে কতটা দূর সেইটে ঠিক করে নেওয়া যাক। তারপর সেখানে খাবার-দাবার জল-বাতাসের কি রকম ব্যবস্থা আছে তারও সংবাদ নিয়ে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা যাবে।

তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করে থাকতে পার। পূর্ণিমার গোলগাল থালার মত পূর্ণ চাঁদই হোক কি প্রতিপদের কাস্তের মত ছোট্ট একটুখানি চাঁদই হোক এর আলো-আঁধারী মিশান সবটা দেহ একসঙ্গে মিলে সব সময়েই প্রায় একই আকারের। আগে লক্ষ্য করে না থাকলেও দু'তিন দিন লক্ষ্য করে দেখ—তা'হলেই বুঝতে পারবে। এমন কেন হয় বলতে পার? একটা জিনিস যদি ঠিক সমান

দূরেই সব সময়েই থাকে তা'হলেই এমন হতে পারে। তোমাদের বাড়ীর পশ্চিমে যে বুড়ো গাছটিকে দেখা যায়, ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেটা যখন কেন না দেখ তখনই একই রকমের দেখতে পাবে। যত কাছে যাবে ততই যেন বড় মনে হবে, আবার দূরে সরে গেলে আরও ছোট মনে হবে। চাঁদ ত সব সময়েই ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে হয়ত পৃথিবী ছেড়ে অনেক দূরেও চলে যেতে পারে; কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলেই দেখতে পাবে সব দিনেই এর আকার প্রায় সমানই রয়েছে—ছোট বড় বিশেষ মনে হয় না—এর কারণটা তা'হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, যদিও এ ঘুরছে তবুও পৃথিবী ছেড়ে বেশী দূরে চলে যাচ্ছে না—সব সময়েই প্রায় সমান দূরেই রয়েছে। কি জানি হয়ত বা আমাদের ভালবেসেই এমনটা করে!

চাঁদ আমাদের থেকে কত দূরে আছে সেইটে প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে। কেমন করে বলতে পার? তোমরা হয়ত জান না। তোমরা ভূগোলে পড়ে থাকবে হিমালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিখর এভারেষ্ট (২৯১৪০) উনত্রিশ হাজার ফিট উচু, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেউ সেখানে উঠতে পারে নি—কতজন উঠতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। একেবারে মাথার উপরে না উঠেও পণ্ডিতেরা কিন্তু এ কতখানি উচু তা ঠিক করে ফেলেছেন—এ হিসেবে একটুও ভুল নেই। হিসেব

কেমন করে করা যায় সে তোমরা বড় হয়ে ভাল করে বুঝতে পারবে। তবে এখনকার মত জেনে রাখ যে, একটা জিনিস কতখানি উঁচু সেটা জানতে হলে সেটা তোমার থেকে কতটা দূরে এবং তার উঁচু মাথাটা তোমার থেকে কেমন বাঁক তাই জানতে পারলেই যথেষ্ট। তেমনি করেই বড় বড় গাছ, পাহাড় ইত্যাদির উচ্চতা ঠিক করা হয়।

চাঁদের দূরত্ব ঠিক এমনিভাবে অবশ্য বের করা যাবে না। একটু ঘুরিয়ে করতে হবে। যারা এই চাঁদ-তারা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন সেই খগোলবিদ্ পণ্ডিতেরা নানা আঁকজোঁক করে চাঁদ আমাদের থেকে কতদূরে আছে তা ঠিক করে নিয়েছেন। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, পৃথিবী থেকে চাঁদ মামা প্রায় আড়াই লাখ (২৫০০০০) মাইল দূরে রয়েছে। এমনিতে এ নড়াচড়া করে বেড়ায়, সে ত তোমরা দেখতেই পাও। তাই এই দূরত্বটাও একটু কম বেশ হয়ে পড়ে। যখন আমাদের কাছে আসে বলতে হয়—তখনকার দূরত্ব হ'ল ২২১৪৬২ মাইল—আর যখন দূরে সরে যায় তখনকার ব্যবধান হ'ল ২৫২৭১০ মাইল। এদের গড় করলে হয় ২৩৮৮৫৭ মাইল। বুঝতেই পারছ কাছে বলতে কত কাছে। একেবারে লাখ দু'লাখের ব্যাপার আর কি!

সামান্য দু-তিনশ' গজ দূরে যে জিনিসগুলো থাকে তাদেরই সব কিছু আমরা ভাল করে দেখতে পাই নে, আর এ ত

লাখ লাখ মাইলের কথা। এত দূরে যে রয়েছে তার ভিতরে যে সত্যি কি আছে তা খালি চোখে ঠিক ভাবে দেখতে চাওয়া পাগলামি বলেই মনে হয় না কি? তাই অস্পষ্টভাবে যা দেখা যায় তাতেই কেউ মনে করে যে, ওর মধ্যে বুড়ী রয়েছে; কেউ মনে করে খরগোস। পুরাকালের পণ্ডিতেরাও কিন্তু এমনি ভুল ধারণা করে নিয়েছিলেন। তাঁরাও ঠিক ধরতে পারেন নি, ওগুলো কি? তাঁরা কি বলতেন জান? তাঁরা বলতেন যে ঐ যে চাঁদ ও আর কিছু নয়, ওটা হ'ল মস্ত বড় একটা আয়না। ওতে যে সব জিনিস দেখা যায় সেগুলো আমাদের পৃথিবীর জিনিসগুলোরই ছায়া মাত্র। আসলে কিন্তু তা নয়। তাঁরাও ভুল করে গেছেন।

তোমরা দূরবীক্ষণের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। এতে অনেক দূরের জিনিস ভালভাবে দেখা যায়। মনে হয় যেন সেগুলো খুব কাছে এসে গেছে। নবম শতাব্দীতে আবুল হাসান নামে এক মুসলমান বৈজ্ঞানিক এই দূরবীক্ষণ আবিষ্কার করেন। এর দ্বারা অনেক কিছু কাজই তিনি করে গেছেন, সে তোমরা বড় হয়ে জানতে পারবে; তবে তিনি চাঁদ দেখে এর ভিতরের জিনিসগুলোকে কি বলেছিলেন তা এখনও জানা যায় নি। চাঁদ সম্বন্ধে প্রথমে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন গ্যালিলিও। গ্যালিলিও ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর মস্ত বড় এক বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তাঁর কথা তাঁর সময়ে লোকে একটুও বিশ্বাস করে নি;

এমন কি পৃথিবী ঘোরে এই কথা বলাতেই তখনকার গোঁড়া খৃষ্টানেরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়। তাঁকে শাস্তিও দেওয়া হয়। পরে কিন্তু পণ্ডিতেরা গ্যালিলিওর কথা সত্য বলে স্বীকার করে নেন।

গ্যালিলিও দেখে শুনে বলেন চাঁদও আমাদের পৃথিবীর মত সম্পূর্ণ আলাদা একটা পৃথিবী, এতে পাহাড় পর্ব্বত নদী সমুদ্র সবই রয়েছে। তাঁর মতে চাঁদের মধ্যেকার কালো দাগগুলো আর কিছু নয়; ওগুলো হ'ল সমুদ্র। অনেকেই তাঁর কথাকে ঠিক বলে মেনে নিয়েছিলেন; এমন কি সমুদ্র-গুলোর নামকরণও করে ফেলেছিলেন—যেমন, মারে ইমব্রিয়াম (Mare Imbrium) বা ঝড়ের সমুদ্র, মারে সিরিনিটাটিস (Mare Serenitatis) শান্তসমুদ্র, মারে ট্রানকুইলিটাটিস (Mare Tranquilitatis) নীথর সমুদ্র, মারে ভেপোরাম (Mare Vaporum), মারে ক্রিসিয়াম (Mare Crisium) ইত্যাদি। এসব নিয়ে চাঁদের একটা ম্যাপও তৈরী করা হয়েছিল তখনকার মত—ঠিক তোমরা যে সব ম্যাপ দেখ তেমনি করেই।

যা হোক গ্যালিলিওর সমুদ্রের কথা এতদিন ধরে লোকে সত্য বলে মেনে নিলেও, এখন কিন্তু সমুদ্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

বড় বড় সমুদ্র ত দূরে থাক, সত্যিই চাঁদের মধ্যে জল

আছে কিনা এখন তাই নিয়েই বেশ সন্দেহ জেগে গেছে। সন্দেহের কারণও অনেক। তবে একটা কারণ হ'ল সূর্য্যের আলো আর জলের সম্বন্ধ নিয়ে।

জলের মধ্যে সব জিনিসেরই প্রতিবিম্ব দেখা যায়; সে তোমরা নিজেরাই দেখে থাকবে। সুন্দর জ্যোছনা রাতে নদীর ধারে বসলে জলের ভিতরকার চাঁদেরই তরতরে সুন্দর প্রতিবিম্ব মন মুগ্ধ করে দেয়। ঠিক এই কথাটাই চাঁদের মধ্যকার জলের সম্বন্ধেও ভেবে দেখ।

চাঁদেও যদি জল থাকত তা'হলে সে জল থেকেও সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত না হয়েই পারত না—সে জলেও সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যেত নিশ্চয়ই।

চাঁদ ঘোরা-ফেরা করে সে ত জানা আছে—সূর্য্যের আলো সব দিক থেকেই এর উপরে পড়ছে, কিন্তু এতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব কোন দিন দেখা যায় না। সামান্য হ্রদের জলেও চিকচিকে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায়; আর চাঁদে সমুদ্র থাকতেও প্রতিবিম্ব দেখা যাবে না এ কি আর একটা কথা! এই প্রতিবিম্বের কথা ছাড়াও এমনিতে এর মধ্যে কোন দিন ছিটেফোঁটা মেঘ বা কুয়াসার লক্ষণও দেখা যায় না। সমুদ্র থাকলে কি আর তা না হয়ে পারত। এমন তো আর হতে পারে না যে, চাঁদে যেয়েই জলের গুণও বদলে গেছে; ওখানকার জলে আর আলো প্রতিফলিত হয় না।

জল যা তা সব সময়ে জলই থাকবে—গুণ আর বদলাবে না। জলই যদি ওগুলো না হয় তা'হলে ওগুলো কি—এই কথাটাই হয়ত তোমরা ভাবছ। পণ্ডিতেরা কি বলেন জান? তাঁরা বলেন ওগুলো আর কিছুই নয়—এই আমাদের সাহারা মরুভূমির মাসতুতো ভাই। ওগুলো আসলে হ'ল কতকগুলো বড় বড় ধু-ধু করা মরুভূমি।

চাঁদ মামার দেশ ত দেখা যাচ্ছে মরুভূমিতে ভরা, সেখানে মামাদের কেউ আছে নাকি? চাঁদ মামার দেশ মামায় ভর্ত্তি হওয়াই উচিত, কি বল? তোমাদের হয়ত মনে হচ্ছে সেখানকার মামা আমাদের পৃথিবীর মামাদের চেয়ে বেশী স্নেহশীল সহৃদয়, হয়ত তাঁদের চেয়েও হাসি-খুসি। চাঁদের নিজেরই যখন এমন হাসি-খুসি চেহারা, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে তখন ওখানকার মানুষগুলোও যে তেমনি হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! ওখানে যেতে পারলে বেশ একবার মজা হ'ত—সেই যে "মামা-বাড়ী বড় মজা কিল-চড় নেই" কথাগুলো একবার পরখ করে দেখা যেত। পৃথিবীর মামা-বাড়ীতে একেবারেই যে কিল-চড় নেই এমন কথাটা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা যায় না—অনেকের ভাগ্যেই মধ্যে মধ্যে ঘটে যায়, কি বল? যাক্ সত্যি সত্যি মামাদের কেউ সেখানে থাকেন কি না সেটা জানতে হলে একবার সেখানে যাওয়াই দরকার। তা'হলে আগে থেকেই সব কিছু যোগাড়যন্ত্র করে নিতে হবে।

যদি সেখানে মামাদের কেউ না-ই থাকেন তা'হলে ব্যাপারটা কেমন হবে বুঝতেই পাচ্ছ। একটা কিছুর অভাব হলেই আর রক্ষে নেই। হয়ত সামান্য একটা জিনিসের জন্যই প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। এই ত দেখ না সামান্য একটু জল তাও সেখানে নেই। ওখানে যাওয়ার জন্যে দরকারী জিনিসের ফর্দ্দ করতে জলের কথাটা ভুলো না, জল কিছু সঙ্গে করে নিতেই হবে।

আমাদের নিত্য সঙ্গী জল আর বাতাস; এ না হলে কিছুতেই চলতে পারে না। জলের খবর ত পাওয়া গেল নৈবচ নৈবচ। কিন্তু বাতাস—বাতাসের কি সংবাদ? পণ্ডিতেরা বলেন—এতেও আশা করার বিশেষ কিছুই নেই। তাঁদের মতে যতদূর দেখা যায় চাঁদে বাতাসও বড় একটা কিছু নেই; থাকলেও এত সামান্য আছে যে, তা দিয়ে আর কাজ কিছু চলবে না। তাঁরা কেন এমন বলেন তা বেশ ভালভাবে বুঝিয়েও দিয়েছেন। তবে এখানে আর সোজা দূরবীক্ষণ দিয়ে নয়।

বাতাস ত স্বচ্ছ—থাক না থাক দূরবীক্ষণ দিয়ে তা আর কি করে ধরা যাবে? বৈজ্ঞানিকেরাও তাই এখানে দূরবীক্ষণের সাহায্য না নিয়ে অন্য পথ ধরেছেন। সেটাকে অবশ্য সরল পথ বলা চলে না, অনেক ঘুরানো আর কি! কিন্তু নিঃসন্দেহ সত্য।

বাতাসের অনেক রকম কেরামতির খবরই ত তোমরা জান। একটা হ'ল এই প্রভাত আর সন্ধ্যার প্রদোষ কাল।

সূর্য্য দেখা যাচ্ছে না অথচ আলো কিছু কিছু আসছে; সূর্য্য রয়েছে পাহাড়ের ওধারে কত নীচে তার দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না অথচ এধারে আলোর অভাব নেই। এটাও হয় বাতাসের জন্যেই। জলে যেমন আলো প্রতিসরিত হয় বাতাসেও তেমনি প্রতিসরিত হয়। আর সেই জন্যেই সূর্য্য দেখা না গেলেও তার আলো দেখা যায়।

যদি চাঁদেও বাতাস থাকত তা'হলে এমনটা নিশ্চয়ই হ'ত। চাঁদে গিয়ে বাতাসের গুণ বদলে গেছে এমন ত কোন কথা হতে পারে না। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে খুব পরীক্ষা করেছেন; চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেছেন। কিন্তু এই প্রদোষ কালের মত কোন কিছুর খবরই পান নি। সূর্য্যের এই ফুটি ফুটি করে বেরোন, আধো আলো আধো ছায়ার কোন আভাস সেখানে একটুও পাওয়া যায় না—যখন বেরুলেন তখন একবারে বেরিয়ে পড়লেন। এতেই মনে হয় বাতাস বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব চাঁদ মামার দেশে নেই। বাতাস থাকলে নিশ্চয়ই এমনটা হ'ত না। তা'হলে দেখছ আমাদের বাতাসেরও বন্দোবস্ত করে নিতে হবে। যাবার সময় খুব করে অক্সিজেন পুরে নিয়ে যেতে হবে যাতে এজন্যে কোন কষ্টই না হয়।

তোমরা হয়ত ভাবছ যেখানে জল-বাতাসের এমন ছুর্ভিক্ষ সেখানে আর কিই বা আছে? জল-বাতাসের এমন

দুর্ভিক্ষ হলেও একটা জিনিস কিন্তু এখানে খুব বেশী পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। সেটা হ'ল পাহাড়। অনেক পাহাড়-পর্ব্বতই আছে এখানে। ভারী মজার কথা না? জল নেই, বাতাস নেই, আর থাকল কি না কতকগুলো পাহাড়, তাদের কাঠ খোট্টা চেহারা নিয়ে। তোমাদের হয়ত বিশ্বাসই হতে চাইছে না। হয়ত ভাবছ জল-বাতাস নেই তার নয় এ কারণ সে কারণ দেখিয়ে একটা কিনারা করা গেল। সে সব প্রমাণ পেয়ে বিশ্বাস করতেও বাধল না। কিন্তু অতগুলো পাহাড় যে আছে তা কি করে বোঝা গেল? পণ্ডিতেরাও তোমাদের মত প্রথম প্রথম একবারেই বিশ্বাস করেন নি; তাঁরাও এমনি খুঁৎখুঁৎ করেছিলেন আগে। এখন কিন্তু আর কেউ অবিশ্বাস করেন না।

তোমরা হয়ত জান যে, ফটো তুলে সেগুলো ইচ্ছেমত বড় ছোট করে নেওয়া যায়। তোমার ছোট্ট একটা ফটো তোলা হয়েছে, কিন্তু তাতেই তুমি সন্তুষ্ট নও; তোমার ইচ্ছে যে, তোমার খুব বড় একটা ফটো তুলে নিয়ে পড়ার ঘরে রেখে দাও। বন্ধু-বান্ধবকে দেখিয়ে বাহবা নেবে। তোমার বাবাকে বলতেই তিনি আর কোন ফটো না তুলে ঐ আগেকার ফটোটাই দিয়ে আসলেন ফটোগ্রাফারের দোকানে। তারপর কয়েকদিন পরে দেখলে তোমার মস্ত বড় একটা ফটো এসে হাজির। এ রকম হয়ত তোমরা অনেকেই দেখে

থাকবে। চাঁদেরও এমনি ফটো তোলা হচ্ছে আজ কাল। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে চাঁদের এক এক অংশ যখন পরীক্ষা করা হয় তখন সেই সেই অংশের ফটো তোলা হয়, সঙ্গে সঙ্গে দূরবীক্ষণকেই ফটো তোলবার যন্ত্র বানিয়ে নিয়ে। এতে সুবিধে হচ্ছে যে, সবটা চাঁদের ফটো একসঙ্গে নিয়ে হিজিবিজি করার চেয়ে টুকরা টুকরা করে ভালভাবে পরীক্ষা করা যায়। এমনি ফটো তুলে সেই ফটোগুলোকে আবার বড় করে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখলে পাহাড়ের অস্তিত্ব চোখে সহজেই ধরা পড়ে। এর পরে হয়ত তোমাদেরও আর পাহাড়ের সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকবে না। এত পাহাড় যখন রয়েছে তখন আমাদের যাবার আগে সাবধান হয়ে যাওয়াই দরকার। যেতে হবে ত হাওয়াই জাহাজে, তা ছাড়া ত আর উপায় নেই। জলের সাগর পাড়ি দিতে হলে যেমন জলেচলা জাহাজ ছাড়া আর কোন গতি নেই, এ বায়ু-সমুদ্রেও তেমন বায়ু-জাহাজের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কি করবার আছে বল? সেটা যাতে ভালভাবে যেয়ে চাঁদ মামার দেশে পৌঁছতে পারে সেজন্যে আগে থাকতে সাবধান হওয়া চাই, নয় কি? হঠাৎ যদি পড়তে পড়তে পাহাড়ের উপর গিয়েই পড় তা'হলে আর ফিরে আসতে হবে না পৃথিবীর কোলে; কিছু দেখতে পাওয়া ত দূরের কথা। যাক্ এই সঙ্গে আর একটা কথাও জেনে রাখ।

বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু এই পাহাড় দেখেই শুধু ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা এদের কে কতটা উচু তাও মেপে ফেলেছেন। তোমরা হয়ত ভারী আশ্চর্য্য হচ্ছ। মাটির পৃথিবীতে বসে চাঁদের পাহাড় কত উচু তা মেপে ঠিক করা একটা বড় কেরামতি বলেই হয়ত তোমাদের মনে হচ্ছে। কিন্তু এ বিশেষ কঠিন কিছু নয়। বড় হয়ে যখন বিজ্ঞান পড়বে তখন দেখবে সত্যি এতে তেমন আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কেমন ব্যাপার হয় জান ?

তোমরা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে সকালবেলা গাছপালা ইত্যাদির ছায়া খুব বড় থাকে। যতই সূর্য্য উপরে উঠতে থাকে ছায়াও ততই ছোট হতে থাকে। সূর্য্য যখন ঠিক মাথার উপরে আসে ছায়াও তখন যায় একেবারে মিলিয়ে, আবার সূর্য্য হেলে পড়লেই ছায়াও আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। চাঁদের পাহাড়গুলোরও অমনি ছায়া পড়ে ; সেই ছায়ার দৈর্ঘ্যও মাপা যায়। এই থেকেই পাহাড় কতটা উচু তা ঠিক করে নিতে অসুবিধা হয় না। যা হোক—এমনি মেপে দেখা গেছে—পাহাড়গুলো খুব ছোট নয়। চাঁদ অত ছোট হলে কি হবে, সেই ঠাকুরমার ঝোলার "বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি"র মত ওর পাহাড়গুলোও বেশ বড় বড়। কোনটা হ'ল ১২০০০ ফিট, কোনটা ১৪০০০ ফিট, কোন কোনটা ১৫০০০ ফিটেরও বেশী উচু। আমাদের পৃথিবীটাকে যদি কেউ ছোট করে চাঁদের সমান করে দেয়, তা'হলে দেখা

যাবে যে, আমাদের এত গর্ব্বের হিমালয়—যার অজেয় এভারেষ্ট পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু বলে এখনও মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে রয়েছে, সেও অনেক ছোট হয়ে গেছে—চাঁদ মামার দেশের কোন কোন পাহাড়ের নাগালই পাচ্ছে না। পাহাড়গুলোর নামকরণও করা হয়েছে,—শুনতে আমাদের পৃথিবীর পাহাড়ের মতই। তোমাদের মজা লাগতে পারে; একটার নাম হ'ল —ককেসস, একটা আল্পস, একটা আপেনাইন, একটা কারপেথিয়ান, ইত্যাদি। একটা জিনিস কিন্তু খুব তাক লাগিয়ে দিয়েছে বৈজ্ঞানিকদের। বেড়াতে গেলে তোমরাও দেখতে পাবে। সেটা হ'ল এই পাহাড়গুলোর আটসাট কাটছাঁট গড়ন। এইমাত্র যেন কেউ একে গড়িয়ে রেখেছে—এতে যেন কারুর কোন হাত পড়ে নি কোন দিন। কোন বৃষ্টিপাত হয় নি—এমন কি অন্য কিছু এর কাছ ঘেঁসেও যায় নি যাতে এর কাটছাঁট চেহারার একটুও এদিক ওদিক হতে পারে। পৃথিবীর পাহাড়গুলো কিন্তু এমনতর আর নেই; কোনটা আর তেমন সরু সরু চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি—সবাই একটু না একটু ভোঁতা হয়ে পড়েছেই।

কারণটা কি ভাল করে বুঝে নেওয়া যাক। আমাদের পৃথিবীতে যেমনি করে পাহাড় ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে চাঁদেও যে ঠিক তেমনি করেই এগুলোর উদ্ভব হয়েছে তা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। কি বল? পৃথিবী কেমন করে হ'ল

সেই কথাটাই ধরা যাক। একটা কথা মনে রেখ যে, হাজার হাজার বৎসর আগেকার পৃথিবীর সঙ্গে আজকার পৃথিবীর তুলনাই হয় না। তখনকার পৃথিবী ছিল একটা গোলাকার গ্যাসের পিণ্ড মাত্র—এ মাটিও ছিল না, পাহাড়ও ছিল না, জলও ছিল না। শুধু একটা জ্বলন্ত পিণ্ড, সব সময়েই সূর্য্যের চারদিকে অনবরত ঘুরছে। তোমরা একটা ঢিল সুতোয় বেঁধে ঘুরালে ঢিলটি যেমনভাবে ঘুরে তেমনি করে আর কি—আগে ত ছিল সূর্য্যের মধ্যেই সূর্য্যের মতই গরম, কিন্তু সূর্য্যের ঘুরনীর চোটে তার থেকে ছিটকে দূরে সরে এসে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে সুরু করে। গ্যাসটা প্রথম ত হ'ল জলের মত একটা তরল পদার্থ। অবশ্য সবটা ত আর জল হয়ে যেতে পারে নি—খানিকটা হ'ল জল আর খানিকটা গ্যাসই রয়ে গেল ঠিক একটা স্পঞ্জের মত আর কি! কিন্তু আর একটু ঠাণ্ডা হতেই আগেকার জল আরও খানিকটা শক্ত হয়ে পড়ল মাটির মত আর এই স্পঞ্জের মত জিনিসটা আর একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। এই সঙ্কোচনের ফলে ভিতরে যা গ্যাস ছিল সেটাও বাইরে এসে ঠাণ্ডায় খানিকটা আবার জল হয়ে পড়ল। এতেই হ'ল সমুদ্রের সৃষ্টি। পূর্ব্বেকার খানিকটা শক্ত হওয়া জিনিস আরও শক্ত হতে লাগল—শুধু বাইরে নয় ভিতরের দিকেও; ফলে শুকনো বেদানার মত অবস্থার সৃষ্টি হ'ল।

বেদানা ত তোমরা দেখেছ—কেমন উচু-নীচু ভাঙ্গা-চোরা

মত। বেদানার মধ্যে দানাগুলো যখন শুকুতে সুরু করে তখন এই উচু-নীচু অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেখানে আগে দানা শুকিয়ে যায় সেখানকার সঙ্কোচনের ফলে সেদিকটা আপনি নেমে পড়ে—অথচ তার পাশটা ঠিক আগের মতই থেকে যায়; তাতেই এই উচু-নীচুর সৃষ্টি। পৃথিবীর বেলাতেও ঠিক এমনি হয়েছে। তবে এর উচু জায়গাগুলো হয়েছে পাহাড়-পর্ব্বত আর যেগুলো খুব বেশী নীচু হয়ে পড়েছে তাতে জল জমে হয়েছে সমুদ্রের সৃষ্টি। এই ত গেল সৃষ্টির গোড়ার কথা। তারপর থেকে এখানে প্রকৃতির কাজ ঠিক নিয়মমত চলছে। আপনা-আপনি সমুদ্রের জল সূর্য্যের তাপে বাষ্প হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে, আবার সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে জলের ধারা নেমে আবার সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়। আমাদের পৃথিবীর পাহাড়গুলোও সৃষ্টি হবার সময় এই চাঁদের পাহাড়গুলোর মত সরু সরু চোখা চোখা কাটছাঁট ছিল, কিন্তু এই বৃষ্টি ও বরফের জন্যেই সেগুলো আস্তে আস্তে ভোঁতা হয়ে এখনকার অবস্থা ধারণ করেছে।

চাঁদ ঠিক এমনিভাবে সৃষ্টি হলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তার মধ্যে জল বা বাতাস কিছুমাত্র থাকতে পারে নি। জল আর বাতাসের অণু-পরমাণুগুলো চাঁদের দেশ ছেড়ে একেবার পগার পার হয়েছে; চাঁদ আর তাদের ধরে রাখতে পারে নি। তাই এখানে জল বা বাতাসের কোন নামগন্ধই নেই; ফল

হয়েছে এই যে, পাহাড়ের মাথায় বৃষ্টি হওয়া বা বরফ জমার কোন সম্ভাবনাই নেই। ব্যাপারটা তা'হলে প্রথম থেকেই কেমন দাঁড়িয়েছে দেখতেই পাচ্ছ। যে পাহাড় পনের হাজার (১৫০০০) ফিট মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছিল তার মাথা তেমনি সরুই রয়েছে। আমাদের এখানকার পাহাড়গুলোর মত ভোঁতা হওয়ার কোন কারণই উপস্থিত হয় নি। আর অন্য কোন কিছুও নেই যাতে এই সরু মাথাগুলো নুইয়ে যেতে পারে। তাই আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে।

এ ত গেল একটা কারণ। এ ছাড়া আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। তোমরা হয়ত দেখে থাকবে, যে জিনিসগুলো এইমাত্র ভাঙ্গাচোরা হচ্ছে তাদের কেমন একটা কাটছাঁট চেহারা থাকে। একটা পাথর ভাঙ্গ দেখবে যেখানে ভাঙ্গছ সেখানটা কেমন ধার ধার হয়ে গেছে। সদ্য ভাঙ্গার জন্য কেমন একটা সরু লাইন চলে গিয়েছে। চাঁদের পাহাড়েও এমনি ভাঙ্গাচোরা চলছে। কেমন করে তা তোমাদের বলছি। চাঁদে ভ্রমণের জন্যে এটা জেনে রাখা খুবই দরকার—নইলে ভীষণ বিপদে পড়তে হবে।

তোমরা উল্কাপাতের কথা বইতে পড়ে থাকবে। কেউ কেউ বা হয়ত দেখেও থাকবে। রাতের বেলায় আকাশের দিকে চাইলেই দেখতে পাবে তারার মত দুই-একটা ছুটে পড়ে যাচ্ছে। তোমার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি

হয়ত বলবেন—ওসব হ'ল দেব-দৈত্যের খেলা—শয়তানের লাফালাফি ; সত্যি কিন্তু এগুলো দেব-দৈত্যের খেলাও নয় শয়তানের লাফালাফিও নয়—এগুলোরই কতক কতক উল্কাপাত। একটা আধটা নয় এমনি শত শত হাজার হাজার উল্কা সব সময়েই পৃথিবীতে পড়ছে। এর অনেকগুলো খুবই ছোট, মাটিতে পড়বার ফুরসত আর তাদের হয় না। তার আগেই তারা বাতাসের মধ্যেই মিলিয়ে যায় ধূলি হয়ে। তারা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারে না—কিন্তু বড় বড় গুলোর বেলায় আর সে কথা খাটে না। কত অনর্থই ঘটায়, কত মানুষ জীবজন্তুই না এদের আঘাতে মারা পড়ে !

চাঁদের দেশেও ঠিক এমনি ব্যাপারই চলছে প্রতিদিনই। সেখানে বৃষ্টির ফোটার মত সব সময়েই লক্ষ লক্ষ উল্কা পড়ছে —অল্প করে ধরলেও সেখানে প্রত্যেক দিন প্রায় আট দশ লাখ উল্কা পড়ছেই। তোমাদের আগেই বলেছি সেখানে বাতাসের নামগন্ধও নেই। তা'হলে ব্যাপারটা কেমন হবে একবার ভেবে দেখ। আমাদের পৃথিবীর দিকে যেগুলো এসে পড়ে তারা অনেকেই এর উপরকার বাতাসে যেয়ে একেবারে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে—মাটি পর্য্যন্ত আর তাদের আসতে হচ্ছে না। যদি উপরে বাতাস না থাকত তা'হলে এই উল্কাবৃষ্টির মধ্যে কাঁহাতক বেঁচে থাকা যেত ? সামান্য একটা ঢিলা গায়ের উপর পড়লেই কেমন লাগে ; সেই সহ্য করা যায় না।

বৃষ্টির সঙ্গে যে শিলা পড়ে তারই আঘাতে কতজন প্রাণ হারায়। আর এ তো উল্কা—ছটাক বা আধ পোয়া ওজনের ঢিল বা শিলা নয়—দু মণ, চার মণ, শ মণ, হাজার মণের জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড; একটা গায়ের উপর পড়লে আর ফিরে চাইতে হ'ত না। শুধু তাই নয়—কি ভীষণ জোরেই না এগুলো ছুটে আসে! সেকেণ্ডে এক একটা ত্রিশ মাইল চল্লিশ মাইল করে ছুটছে। তোমরা মোটর গাড়ী চড়ে বেড়াও, কোনটা বা চলে ঘণ্টায় দশ মাইল, কোনটা বা কুড়ি মাইল। যেটা ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল চলে সেটা একেবারে যাকে বলে—বায়ু-বেগে—তেমনি ভাবে চলে—সম্মুখে পড়লে আর রক্ষে নেই। মনে রেখ, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল, বেগে চলা মোটর গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগলে যে ক্ষতি হতে পারে, আধ ছটাক ওজনের একটি ছোট লোহার জিনিস সেকেণ্ডে ত্রিশ মাইল চলে ঠিক ততটা ক্ষতি করতে পারে। বন্দুকের গুলিতে বাঘ মানুষ মরার কারণ অনেকটা এই। কি জোরেই না ছোটে! তা'হলে বুঝতে পারছ এই হাজার মণ ভারী এক একটা উল্কা যখন সেকেণ্ডে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল গতিতে এসে পড়ে তখন কি ব্যাপারটাই না ঘটে! খোদাকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাদের পৃথিবীর উপর দিয়ে এমনি একটা বাতাসের ছাতা রেখে দিয়েছেন—উল্কাবৃষ্টিগুলো রুধবার জন্যে।

তোমাদের হয়ত মনে মনে একটু অবিশ্বাস হচ্ছে—সত্যিই

একটি টেলিস্কোপ
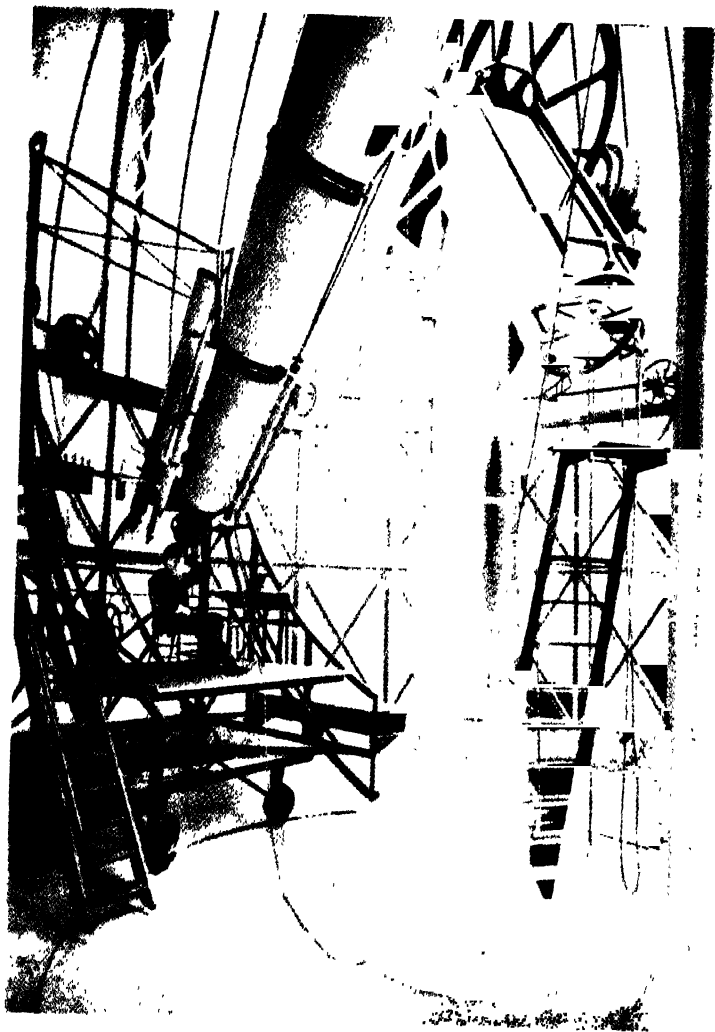
যদি এমনি ব্যাপার হয় তা'হলে চাঁদ মামার দেশে মানুষ থাকবে কি করে—আর সত্যিই যে এমনি হচ্ছে তারই বা প্রমাণ কি? মানুষ আছে কিনা পরে ভাবা যাবে; তবে সত্যিই যে এমন হচ্ছে তার দু'-চারটে প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া গেছে। তোমরা শুনে রাখ।

যাঁরা দূরবীক্ষণ নিয়ে চাঁদের দেশের খবর নেবার জন্য ব্যস্ত রয়েছেন তাঁরা অনেক সময় একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করে থাকেন। মধ্যে মধ্যে সেখানে ধূলির মেঘ বয়ে যায়। ঠিক যেন পাহাড়-পর্ব্বত ভেঙ্গে গুঁড়া হয়ে ধূলি হয়ে গেছে। এ ধূলি আসে কোত্থেকে? এর একমাত্র কারণ হতে পারে পাহাড় ভেঙ্গে যাওয়া। তা ছাড়া আর কোন কারণ থাকতে পারে না; কিন্তু সে পাহাড়ই বা অমনি অমনি ভাঙ্গবে কেন? যদি বৃষ্টি থাকত,—বোঝা যেত যে অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে—কি বরফ পড়বার কোন সম্ভাবনা থাকত, তা'হলেও বা না হয় এ পাহাড় ভাঙ্গার কারণ পাওয়া যেত; কিন্তু তা যখন নয় তখন এটা যে উল্কারই কাজ তার আর কোন সন্দেহই নেই।

চাঁদ মামার দেশে শুধু পাহাড়ের যে খবর পাওয়া যায়, তা নয়; আর একটা জিনিস এখানে খুব বেশী রকমের দেখা যায়, সে হ'ল খাদ (craters)—ছোট বড় নানা রকমের নানা সাইজের অসংখ্য খাদ। তোমরা যারা দার্জ্জিলিং গিয়েছ তাদের এ খাদ সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকতে পারে। রেলগাড়ী

কি মোটরে করে যেতে নীচের দিকে তাকালে দেখবে কত নীচে তলা, সেখানে রয়েছে অসংখ্য বনানী গাছপালা নিয়ে। এমনি হেঁটে বেড়াতেও কত দেখা যায়। কার্সিয়াং ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে নীচের খাদের দৃশ্য কি সুন্দর! এমনি খাদ চাঁদের ভিতর হাজার হাজার রয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকেরা এদের খুব ভালভাবেই চিনেন—এমন কি অনেকগুলোর নামকরণ পর্য্যন্তও করে ফেলেছেন; কোনটার নাম এরিষ্টটল, কোনটার নাম টলেমি, কোনটার নাম কোপারনিকাস, কোনটার নাম প্লেটো ইত্যাদি। শুধু নাম দিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। এদের স্বভাব, পরিচয়, কে কত বড় তাও সব তাঁরা ঠিক করে ফেলেছেন! এই যেমন প্লেটো, এর পূব দিকের পাহাড়টা হ'ল ৩৮০০ ফিট উচু—পশ্চিম দিকটা একটু খাট বটে—তবে তার একটা শৃঙ্গ হ'ল ৭৩০০ ফিট উচু; খাদটি প্রায় বৃত্তাকার—ব্যাস ৬০ মাইল আর আয়তন প্রায় ২৭০০ বর্গমাইল। এই প্লেটোর কাছে কাছেই রয়েছে কতকগুলো ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত পাহাড়—তার মধ্যে পিকো পাহাড় হ'ল সব চেয়ে বড়, এটা হ'ল ৮০০০ ফিট উচু।

যাক্ এদের সবগুলোর খবর বিশেষ জেনে আমাদের দরকার নেই। এরা কেমন করে হ'ল তাই আগে শোনা যাক্।

কারুর কারুর মতে এই উল্কাপাতের ফলেই এই খাদগুলোরও উদ্ভব হয়েছে। সেটা হয়ত অসম্ভব নয় বরং ছোট

ছোট খাদগুলো এই যে উল্কাবৃষ্টির ফলেই হয়েছে তাতে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। তবে সবগুলো যে হয় নি তাও মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদের পৃথিবীতে উল্কাপাত হয় সে খবর তোমাদের জানা আছে—এমনি উল্কাপাতে অনেক খাদেরও সৃষ্টি হয়েছে। এই খাদগুলোর সঙ্গে চাঁদের মধ্যেকার খাদগুলোর তুলনা করলেই এ কথাটা ধরা পড়ে; সবগুলো খাদ যে উল্কাপাতের জন্য নয় তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। তা ছাড়া এই প্লেটো বা তার চেয়েও বড় বড় যে খাদগুলোর পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলো উল্কার দ্বারা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। এতেই মনে হয় এগুলো হয়েছে ভিতরকার কোন কারণে। সে কারণটা খুঁজে বের করা বিশেষ কষ্টকর নয়। আবার সৃষ্টির গোড়ায় চলে যাওয়া যাক্।

তোমাদের আগেই বলেছি গ্যাস ঠাণ্ডা হয়ে জলের মত তরল পদার্থে পরিণত হয়। এই জলীয় পদার্থ আর একটু ঠাণ্ডা হতেই উপরে সরের মত একটা স্তর পড়ে যায়। ভিতরে আর একটু শক্ত হয়ে উঠতেই উচু-নীচুর সৃষ্টি হয়ে পাহাড়-পর্ব্বতের সৃষ্টি হয়ে পড়ে। কিন্তু ভিতরে ত আর সবগুলো একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে না—কতক থেকে যায় আগের মতই গরম। তাই উপরে সর পড়ে গেলে কি হবে—সরের নীচে পূর্ব্বের মতই গরম রয়ে গেছে। দুধের হাঁড়ির দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে জ্বাল দিবার সঙ্গে সঙ্গে সর

পড়তে সুরু করে। খানিকটা পরেই সরের উপর তুমি বেশ হাত দিতে পার, কিন্তু আঙ্গুলটা একটু জোরে ঠেলে দিলেই দেখবে কি গরম! সামান্য দুধের বেলায়ই যখন এই অবস্থা তখন এই প্রকাণ্ড জিনিসটায় যে ব্যাপার কি দাঁড়াতে পারে সহজেই বুঝতে পার।

চাঁদ কি পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হতে সুরু করেছিল তখন উপরটা ঠাণ্ডা হয়ে পাহাড়-পর্ব্বতের সৃষ্টি হলে কি হবে—ভিতরকার গরম গ্যাস, গরম জল তেমনি আবদ্ধ রয়ে গেছে। পৃথিবীর নীচে যে এখনও তেমন অনেক আছে সে ত এমনি বোঝা যায় আগ্নেয়গিরির উৎপাত থেকেই। মাটি খুড়ে একটু নীচে গেলেই নীচের দিকে যে কত গরম তা বুঝতে পারা যায়। কয়লার খনিতে তোমরা যারা নেমে গিয়েছ তারা হয়ত এবিষয় কিছু সাক্ষ্য দিতে পার। পৃথিবীর ভিতরকার খবর তোমাদের পরে জানাব।

যা হোক এই গরম গ্যাস ও গরম জল কিন্তু কিছুতেই নীচে থাকতে চায় না। তারা সব সময়েই উপরে উঠতে চাচ্ছে—একটু ফাঁক পেলেই আর রক্ষা নেই, হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। চাঁদের বেলায়ও সে ব্যাপারের একটুও কমতি হয় নি। বরং পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশী রকমই হয়েছে আর বোধ হয় তাতেই হয়েছে এই সব খাদের সৃষ্টি।

এত যখন খাদ রয়েছে তখন চাঁদের দেশে আগ্নেয়গিরির

ছাইএর খুবই প্রাচুর্ভাব হবে বলে মনে হচ্ছে, কি বল? এত আগ্নেয়গিরি আর তার সবগুলোই ফুটিফাটা হয়ে বের হয়ে পড়েছে, তা ছাড়া উল্কাগুলোও ত গুড়িগুড়ি হয়ে গেছে ধূলোর মত। উল্কাতেই বা কি থাকে—মাটি বলতে খুব কমই থাকে, বরং ছাইই বেশী আর এই ছাইগুলো আর কোথায় যাবে? জল নেই বৃষ্টি নেই যে আস্তে আস্তে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। জল থাকলে না হয় একটা কথা ছিল—ছাইগুলোর একটা পথ হ'ত। আমাদের পৃথিবীর মত আস্তে আস্তে মাটিতে পরিণত হ'ত, গাছপালার উদ্ভব হ'ত, শ্যামল বনানীতে পরিণত হয়ে কবির কাব্যের খোরাক যোগাত—সাধারণ মানুষের ব্যবহারেও লেগে যেত। কিন্তু তা ত হচ্ছে না।

পণ্ডিতদের মনেও এমনি ভাবনা জেগেছে—সত্যি সত্যিই এখানে মাটির বদলে ছাইএর প্রাচুর্ভাব বেশী কিনা? তার পরীক্ষা তাঁরা করছেন এবং ঠিক করেও ফেলেছেন বলা চলে। আমাদের আগে থেকে জেনে নেওয়াই ভাল। বাইরে থেকে একে যতই দধি সমুদ্র, ক্ষীর সমুদ্রের দেশ বলা হোক না কেন, আসলে এতে দধি-ক্ষীরের কোন স্থান আছে কিনা সেটা এখানে থাকতেই বিবেচনা করা মন্দ কি? জ্যোছনায় ভরা রাতের চাঁদের আলোতে মনপ্রাণ কেমন জুড়িয়ে যায়, সেই জ্যোছনার দেশে যে অমন মন-জুড়ান জিনিস থাকবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তোমরা হয়ত

মনে মনে ভাব চাঁদ মামার দেশে কুলপী বরফের ডিপো, সন্দেশ-রসগোল্লার খনি, দধি-ক্ষীরের সমুদ্র—এমনি অনেক কিছুই আছে ; একবার যেতে পারলে হয়, আর কোন ভাবনা নেই। মামার বাড়ীর মজা লোটা যায়। দধি-সন্দেশ খাও, ইচ্ছে কর ত রসগোল্লা নিয়ে বল লোফালুফি সুরু কর—কি ফুর্ত্তি—নাচতে ইচ্ছে করে, কি বল ? কিন্তু যদি না থাকে তা'হলে বিপদটা কেমন বুঝতেই পারছ !

বৈজ্ঞানিকেরা কি বলেন জান ? তাঁরা বলেন ওসব কিছুই নেই। চাঁদ মামার দেশে আছে শুধু ছাইয়ের গাদা। আর কিছুই নেই। ভারী আশ্চর্য্যের কথা নয় কি ? যাক তাঁরা কেমন করে এ ঠিক করলেন শুনে রাখ।

তোমরা রামধনু হয়ত সবাই দেখেছ—এর রংএর বাহার দেখে কার না মন মুগ্ধ হয় ? ভাল করে দেখলে দেখা যাবে এতে রয়েছে সাতটি রং। এই যে সাতটি রং এরাই হ'ল আসল—এদের মিশুলে আমরা যে সাদা আলো দেখি তারই সৃষ্টি হয়। আমাদের নিত্য পরিচিত সূর্য্যের সাদা আলোর মধ্যে যে এমনি সাতটি রং আছে সে তোমরা ইচ্ছে করলে নিজেরাই দেখতে পার। একটি তেশিরা কাঁচ নিয়ে সূর্য্যের আলোর দিকে তাকালেই দেখবে, সাদা আলোর জায়গায় দেখা যাচ্ছে কতকগুলো বাহারের আলো—গুনলে দেখবে এতে আছে সব সমেত সাতটি রং।

তোমরা যখন বড় হয়ে স্পেক্ট্রোস্কোপ (Spectroscope) নিয়ে নাড়াচাড়া করবে, তখন এ সম্বন্ধে আরও ভাল করে জানতে পারবে। তবে এখন একটা কথা জেনে রাখলেই চলবে যে, এক একটা জিনিসের যেমন এক একটা নিজস্ব গুণ আছে, আলোর বেলায়ও তেমনি এক একটা আলোর এক একটা নিজস্ব বাহাদুরী আছে যা অন্য কারুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

সাদা আলোতেও আমরা লাল জিনিসকে লালই দেখি, নীল জিনিসকে নীলই দেখি, সাদা দেখি না, এর কারণ হ'ল আলোর ভাগাভাগির ব্যাপার। লাল গোলাপ ফুলের উপর সূর্য্যের সাদা আলো পড়লে কি হবে—সে সাদা আলোর লাল অংশ ছাড়া অন্যগুলোকে একেবারে মিলিয়ে দেবে নিজের মধ্যে, শুধু লাল আলোটাকেই ঠেলে দেবে বাইরের দিকে; তাতেই আমরা তাকে লালই দেখতে পাই। কিন্তু তুমি যদি একটা নীল কাঁচ নিয়ে লাল ফুলের দিকে তাকাও তা'হলে দেখবে ফুলটাকে আর নীল দেখাচ্ছে না—সেটা যেন কালো হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। যেগুলো চোখে দেখতে একই জিনিস বোধ হয়, সেগুলো সত্যই একই জিনিস কিনা এমনি ভাবে তার পরীক্ষা করা যায়। তাদের আলো বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় যে একই রকমের তা'হলে বুঝতে হবে দুটো একই জিনিস। পরীক্ষা করে

দেখা গিয়েছে দুটো আসলে বিভিন্ন জিনিস—চোখে একই রকম মনে হলেও এই আলো বিশ্লেষণের বেলায় একই রকমের আলো কিছুতেই দিতে পারে না। এখানেই তাদের বিভিন্নতা ধরা পড়ে। ঠিক এমনি ভাবে অন্য জিনিস কেমন আলো দেয় তা দেখে জিনিসটা কি ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে। যেগুলো এমনিতে কোন আলো দেয় না, সেগুলো আগুনে ধরে বা পুড়িয়ে যে আলো পাওয়া যায় তা থেকেই তার পরিচয় বের করে নেওয়া যায়।

চাঁদের বেলায়ও এই পরীক্ষা চালান গিয়েছে। নানা সময়কার নানা অংশের আলো নিয়ে এমনি পরীক্ষা করে দেখা গেছে—সব জায়গাই একই জিনিসের তৈরী। তা ছাড়া এর আলো বিশ্লেষণ করে যে ফল পাওয়া যায় আমাদের পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির ছাইএর আলো বিশ্লেষণ করেও ঠিক সেই ফল পাওয়া যায়। তাতেই মনে হয় সারা চাঁদ জুড়ে রয়েছে আগ্নেয়গিরির ছাই। তবে দুই-এক জায়গায় সামান্য সামান্য গন্ধকের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ঠিক এই উপায় থেকেই।

ছাই যে এখানকার মস্ত বড় একটা উপাদান অন্য উপায়েও তার প্রমাণ হয়ে গেছে। তোমরা হয়ত জান হাতে ছাই নিয়ে তার উপর আগুন রাখলে হাতে একটুও তাপ লাগে না। এর কারণ কি জান? কারণ হ'ল ছাই জিনিসটা একটুও উত্তাপ-বাহক নয়। একখণ্ড লোহার একদিক আগুনের

আলোর বর্ণ-বিশ্লেষণ

মধ্যে ধর, দেখবে একটু পরে তুমি আর হাত দিয়ে ধরে রাখতে পারছ না। অন্যদিকের সাথে যদিও আগুনের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই তবুও সেদিকে তাপটা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছে, কিন্তু একখণ্ড কাঠ নিয়ে আগুনে ধর, ওদিক পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও এদিকে তাপের কোন নামগন্ধও নেই। এই প্রভেদের কারণ হ'ল তাপ-বাহনের ক্ষমতা। লোহা খুব তাড়াতাড়ি তাপ বইতে পারে; কিন্তু কাঠ ত পারে না। ছাইও এই শেষোক্ত শ্রেণীর। ছাইএর গাদার উপরে আগুন রাখলে কি ব্যাপারটা হবে ভেবে দেখ—যতক্ষণ আগুন রয়েছে ততক্ষণ ত উপরে হাত দিলেই আগুনের তাপটা পুরোপুরি টের পাবে—থারমোমিটার নিয়ে দেখলে দেখবে তাতে আগুনের তাপটাই উঠে পড়েছে। আগুন সরিয়ে নেও, এবার হাত দিয়ে দেখ ছাই আগেও যেমন ঠাণ্ডা ছিল এখনও তেমনি ঠাণ্ডা—থারমোমিটার দিয়ে দেখ কোন তাপই নেই। ছাই একটুও তাপ-বাহক না হওয়াতে তাতে একটুও তাপ নেই।

চাঁদের ব্যাপারটা ভেবে দেখা যাক। চাঁদে সূর্য্যের আলো এবং রোদ পড়ে। যতক্ষণ এই আলো ও রোদ কোন রকমে ঢাকা না পড়ছে, ততক্ষণ চাঁদের আলোও উত্তাপের খবর পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু যখন এগুলো ঢাকা পড়ছে—যেমন চন্দ্রগ্রহণের বেলায়—তখন কি ব্যাপার হবে? সূর্য্যের আলো বা উত্তাপ কিছুই চাঁদে আসছে না। চাঁদে

বাতাস বলেও কিছু নেই যে পৃথিবীর বাতাসের মত আগেকার তাপ খানিকটা আটকে রাখবে অর্থাৎ আগে একবার গরম হয়ে উঠেছে, তাই এখন তাপ না পেলেও তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হবে না—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গরম থাকবে। এখন চাঁদের মাটিতে যদি গরম আটকে থাকে তবেই এই গ্রহণের সময়ও চাঁদের উত্তাপ আগেকার মতই থাকবে। কিন্তু যদি ছাই বা তেমনি কিছু উত্তাপ-অবাহক থাকে তা'হলে আর সে সুবিধে হবে না। যতক্ষণ সূর্য্যের আলো পড়বে ততক্ষণই গরম থাকবে; সূর্য্য ঢাকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাপও অদৃশ্য হবে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে—সত্যি সত্যিই এমনি ব্যাপারই হয়।

মানমন্দিরে বসে বসে দূরবীক্ষণ দিয়ে চাঁদ তারা গ্রহ উপগ্রহ দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর উত্তাপ কত বৈজ্ঞানিকেরা তা ঠিক করে নিতে পারেন এক প্রকার উত্তাপ নির্ণায়ক যন্ত্র ব্যবহার করে। এতে যখন যেমন দরকার—আকাশের যে কোন গ্রহ-নক্ষত্রেরই উত্তাপ ঠিক করা যায়। এমনি করে গ্রহণের সময় চাঁদেরও উত্তাপ নিয়ে দেখা গিয়েছে যে, যেই পৃথিবীর ছায়াতে চাঁদের কোন জায়গা ঢাকা পড়ছে—অমনি সেখানে তাপ খুব তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে; হয়ত গ্রহণের আগে সেখানকার তাপ দেখা গেল ২০০° ডিগ্রী, গ্রহণের কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেখানকার তাপ হয়ে

গেল শূন্যেরও নীচে ১৫০° ডিগ্রী, যা আমরা সাধারণতঃ কল্পনাও করতে পারি না।

এতেই মনে হয় চাঁদের উপরে গরম আটকে রাখে এমন কিছুই নেই। পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির ছাইতেও এই গরম আটকে রাখবার অক্ষমতা ভালভাবেই দেখা যায়। তুইয়ের যখন একই রকম ব্যবহার—তখন বুঝতে হবে যে, খুব সম্ভবতঃ চাঁদের উপরিভাগে শুধু এমনি ছাইই রয়েছে।

চাঁদ মামার দেশের অনেক কিছুই জানা হয়ে গেল, এখন যাওয়ার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। কি বল ? তোমাদের আগেই বলেছি চাঁদ মামার দেশে বাতাস নেই বললেই হয়—সেখানে গিয়ে পৌঁছুলেই হবে না, বাতাসের জন্য যাতে কষ্ট না পেতে হয় তার বন্দোবস্তও করতে হবে। শুধু সেখানেই যে বাতাসের দরকার তা নয়। আমাদের পথের মধ্যেও কম দরকার হবে না। তোমরা হয়ত জান আমাদের পৃথিবীর উপরে খুব বেশীদূর পর্য্যন্ত বাতাস নেই। আমাদের এই আড়াই লক্ষ মাইল পথের প্রায় সবটাই বাতাসশূন্য। এ পথেও ত বাতাসের দরকার! অনেকটা বাতাসই তা'হলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। তোমাদের হয়ত মনে হচ্ছে এ ত আবার আচ্ছা এক লটঘট ব্যাপার। এখান থেকে না হয় কোন রকমে হাওয়াই জাহাজে উঠতে পারলেই হ'ল, কিন্তু তারপরে চাঁদের মধ্যে আবার ঐ সব বয়ে নিয়ে বেড়াবে

কে ? খুব ত সুখের মামার বাড়ী যাওয়া দেখছি ! কোথায় আরাম করে মজাসে খেয়ে দেয়ে ফুর্ত্তি করা, তা নয় পিঠের উপর পাঁচ ছ মণের একটা বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াও।

অত ভয়ের কোন কারণ নেই। পণ্ডিতেরা খুবই অভয় দিচ্ছেন—এখান থেকে কোন প্রকারে কিছুটা নিয়ে পৌঁছতে পারলেই হয়—সেখানে যেয়ে দেখবে এত হালকা হয়ে গেছে যে আর বড় মালুম হচ্ছে না। মনে কর তুমি দেড় মণ জিনিস অনায়াসে নিতে পার। সেটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছ, অবশ্য একটু কষ্ট হচ্ছে তবে খুব বেশী না ; কিন্তু এই দেড় মণ জিনিস যদি হঠাৎ দশ সেরে পরিণত হয় তা'হলে কি মন হবে ? তখন তুমি ফুর্ত্তিসে নিয়ে যেতে পারবে—কষ্ট কিছুই লাগবে না। এই চাঁদ মামার দেশেও ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটবে। আমাদের এখানে যা ওজনে ছ মণ ভারী, ওখানে তার ওজন হবে এক মণ মাত্র ! তোমরা হয়ত আশ্চর্য্য হচ্ছ—তা কি করে হতে পারে ? জিনিস যখন কমল না তখন ওজন কমবে কি করে ?

একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে ওজন কমাটা একটুও আশ্চর্য্যের নয়। আমরা জিনিসগুলোর যে ওজন দেখি সেটা হ'ল—পৃথিবী যত জোরে জিনিসগুলোকে নিজের দিকে টানছে তারই একটা পরিমাপ। এই টানটা নির্ভর করে তার নিজের শক্তির উপরে। তেমনি যখন চাঁদে যাওয়া যাবে তখন চাঁদ যত জোরে নিজের দিকে জিনিসগুলোকে টানবে

সেই হবে সেখানে সেই জিনিসগুলোর ওজন। চাঁদ ত নিজেই ছোট—এর টানটাও যে সেই অনুপাতে কম হবে তা ত বোঝাই যায়। নিজেরই কম শক্তি, তা আর টানবে কত জোরে? হিসেব করে দেখা গেছে পৃথিবী চাঁদের চেয়ে ছয়গুণ জোরে নিজের দিকে টানতে পারে; তার অর্থ হ'ল, যে জিনিসের ওজন চাঁদে হবে মাত্র একমণ, পৃথিবীতে তার ওজন হবে ছয় মণ। শুধু অন্য জিনিসের বেলায় নয়, নিজেদের বেলায়ও তাই দেখবে—কেমন যেন খুব হালকা হালকা মনে হচ্ছে। পা যেন আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না, নাচতে কুঁদতে চায়। এখানে যাদের আফসোস আছে কিছুতেই লংজাম্পে বা হাইজাম্পে চ্যাম্পিয়ন হতে পারছ না, তাদের আফসোসের আর দরকার নেই। চাঁদে যেয়ে জাম্পে এমন রেকর্ড করে আসতে পারবে যে, পৃথিবীতে কেউ কোন দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। যে এখানে লংজাম্পে পাঁচ ফিট মাত্র যেতে পার সে চাঁদে যাবে ত্রিশ ফিট; হাইজাম্পে যে উঠতে পার মাত্র চার ফিট সে ওখানে উঠবে চব্বিশ ফিট। কি বাহাছুরী, কি বল! তোমাদের মধ্যে যার এসব বিষয়ে একটু নাম আছে তার ত কথাই নেই। সে ইচ্ছা করলেই হাইজাম্পে পঞ্চাশ-ষাট ফিট আর লংজাম্পে দেড়শ, ছু'শ ফিটের রেকর্ড করে আসতে পারবে।

তোমাদের মধ্যে যারা ফুটবল খেলতে ভালবাস অথচ কিক্ করে পাঁচ-ছ ফিটের বেশী ফুটবলকে নড়াতে পার না—

তাদেরও আর আফসোসের দরকার নেই—ওখানে দেখবে কিক্ করলেই বলটা মাঠের এপার ওপার হয়ে যাবে, উঁচু করে দিলে এত উঁচুতে উঠবে যে চোখেই দেখতে পাওয়া যাবে না খানিকক্ষণ। যাদের লোফালুফি করার অভ্যাস আছে তাদের আর পায় কে?—আটদশ পাউণ্ড ওজনের এক একটা জিনিস ছুড়ে দেবে প্রায় আধ মাইলটাক দূরে।

যাক্, দেখা যাচ্ছে বাতাসের জন্য ভয়ের বিশেষ কারণ নেই, অনেকখানি নিয়ে গেলেও বয়ে বেড়াতে কষ্ট হবে না, লাঠি-ছাতার মত বয়ে বেড়ান যাবে। কিন্তু কি জান—ভয় যা সে হ'ল এই জল নিয়ে। জল অবশ্য বয়ে নিতে কোন কষ্ট হবে না, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে যে সেখানে খুলে রাখবার যো নেই। টাইট করে মুখ বন্ধ করা পাত্রের মধ্যেই সব সময় রেখে দিতে হবে, একটু অন্যমনস্ক হলেই গেছে। দেখবে দশ মিনিটের মধ্যে জলের আর নামগন্ধও নেই। সব হাওয়া হয়ে কখন যে উড়ে গেছে সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত তা কিছু টেরও পাবে না। তোমাদের হয়ত বিশ্বাসই হচ্ছে না। এখানে এক ঘটি জল রেখে দিলে সারা বৎসরেও তার কোন কম বেশী হয় না—যেমনকার তেমনি থাকে, পোকা জন্মে মশা ডিম পাড়ে, আর ওখানে দশ মিনিটের মধ্যে সব নিঃশেষে উড়ে যাবে? এ যে একেবারে ছুস্ মন্ত্রের কথা! কিন্তু সত্যিই তাই। এর কারণও হ'ল বাতাসের অভাব।

তোমরা হয়ত জান জ্বাল দিলে ২১২° ডিগ্রী উত্তাপে সমস্ত জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। পৃথিবীর সমতল ভূমিতে প্রায় সর্ব্বত্রই এই রকমের, কিন্তু একটু উপরে উঠলেই আর এতটা তাপ দেবার দরকার হয় না। দার্জ্জিলিংএ যারা গেছ তা'রা এ বিষয় লক্ষ্য করে থাকবে। সেখানে হয়ত ১৬০° কি ১৭০° ডিগ্রী উত্তাপেই জল টগবগ করে ফুটছে। এই জল ফোটা নির্ভর করে উপরের বাতাসের চাপের উপর। জলের উপরকার বাতাসের চাপ যদি বেশী হয় তা'হলে একে ফোটাতে গিয়ে বেশী করে গরম করতে হবে—নইলে কিছুতেই ফুটবে না, আর যদি বাতাসের চাপ কম হয় তা'হলে বেশী তাপেরও দরকার হবে না—অল্প খানিকটা গরম করলেই জল টগবগ করে ফুটে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। চাঁদে বাতাস না থাকার মধ্যেই, সে কথা ত তোমরা আগেই পড়েছ; তাই সেখানে জল ফুটাতে বেশী গরমের দরকার নেই। যা একটু গরম আছে তাই যথেষ্ট। এতেই জল বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে বেশী দেরীও হবে না।

চাঁদ মামার দেশে যেতে আজকাল আর ভাবনার দরকার বেশী নেই। এমনি ত এরোপ্লেন কত উচুতে উঠে, আরও খানিকটা গেলেই হয়ত বা চাঁদের দেশে পৌঁছে যাবে। এতদিন হয়ত অনেক আগেই চলে যাওয়া যেত, কিন্তু একটু মুস্কিলে পড়া গেছে এই পৃথিবীকে নিয়েই। এ কোন জিনিসকেই,

সে যাই হোক না কেন—ছোট একটু ঢিলা যার দাম কিছু বলতে কিছু না—তাকেও কিছুতেই নিজের কোল ছেড়ে যেতে দেবে না। ঠিক আমাদের মায়ের মতই আর কি—কোথাও যেতে দেওয়া হবে না ছেলেকে। পৃথিবীটা সব সময়েই সব জিনিসকেই নিজের দিকে টানছে। যাদের এই টান ছাড়িয়ে যাবার শক্তি নেই—তাদের ফিরে আসতেই হবে—তা যত দূরেই উঠে যাক্‌না কেন। চাঁদ মামাও কিন্তু কম যান না; তিনিও তাঁর নিজের দিকে টানতে কসুর করেন না, নিজের আওতার মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলোকে কিছুতেই বাইরে যেতে দেবেন না, আর পারলে বাইরের দু-একটাকেও যে টান দেন না তাও নয়। তবে নিজে যেমন ছোট তাঁর টানটাও সেই অনুসারে ছোট। পৃথিবীর সঙ্গে পারবেন কেন?

দুয়ের মধ্যেকার এই আড়াই লক্ষ মাইলের মধ্যে একটা জায়গা আছে—যেখানে দুইজনের টানই সমান; পৃথিবীও নিজের দিকে যত জোরে টানছে—চাঁদও ঠিক তত জোরে তার দিকে টানছে। ঠিক এই জায়গাটিতে যেয়ে পড়লে আর কারুর উদ্ধারের আশা নেই। ত্রিশঙ্কুর মত মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঝুলতে হবে আর কি! কোনদিকে আর বেশী টান নেই যে সেই দিকে ঝুঁকে পড়বে। কিন্তু এদিক ওদিক হলে আর রক্ষে নেই। যদি পৃথিবীর এই দিকে ঝুঁকে পড়ে, তা'হলে নির্ঘাত পৃথিবীতে এসে পড়তে হবে—কেউ আটকে রাখতে পারবে না, আর যদি

চাঁদের ওদিকে ঝুঁকে পড়ে, তা'হলে একেবারে চাঁদ মামার দেশে গিয়ে উপস্থিত—আর কোন দিকে চাইতে হবে না। হিসেব করে দেখা গেছে যদি কোন উড়ো জাহাজকে এখান থেকে ঘণ্টায় ২৫২০০ মাইল বেগে ছাড়তে পারা যায় তবে সেটা চাঁদে যেয়ে পৌঁছুতে পারবে কোন রকমে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে। পঁচিশ হাজারের কম হলে আবার নির্ঘাত পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে—কিছুতেই এর মায়ার ডোর কাটাতে পারবে না। এমনি একখানা উড়ো জাহাজ পেলে আর ভাবনা নেই। মজাসে মালপত্র বোঝাই করে গিয়ে উঠলেই হ'ল, তারপরেই ঘুম দাও—কি যা ইচ্ছে তাই কর—দেখবে ঠিক দু দিন পরে চাঁদের দেশে পৌঁছে গেছ; আর পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। পৃথিবীর মত উপরে নীল আকাশও নেই, কি নীচে শস্য-শ্যামল বনানী বা সমুদ্রের জল-কল্লোল কিছুই নেই।

চাঁদের আকাশ নীল ত নয়ই বরং কালো। মজার দেশের মজার কথার মত হলেও না হয় বুঝা যেত নীল আকাশ সবুজে পরিণত হয়ে গেছে—এ তাও নয়, বরং একেবারে সৃষ্টিছাড়া ভাবে কালো হয়ে গেছে। ঠিক যেন কালো মেঘ সব সময়েই আকাশের সারা গা জুড়ে রয়েছে। সব চেয়ে মজা হবে কিন্তু পৃথিবী থেকে যাবার সময় এর উপরকার দৃশ্য দেখতে। তোমরা যারা দার্জ্জিলিং গিয়েছ—তারা পাহাড়ে উঠবার সময় নীচেকার দৃশ্য নিশ্চয়ই দেখেছ—কোথাও বা সাদা ঝকঝকে তুষার,

আবার কোথাও রঙীন আলোতে ভরপুর। এ পথেও তেমনি আলোর ছড়াছড়ি। প্রথম কিছুক্ষণ আমরা এমনি যেমন ফিকে নীল আকাশ দেখি তেমনি নীল, খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল আর আগেকার মতন তেমন ফিকে নীল নয় এবারে অনেকটা গাঢ়, আবার খানিক পরে খুবই গাঢ় নীল। আবার দৃশ্যপট বদলে যাওয়ার মত রংও বদলে গেল; এবার হয়ে গেল গাঢ় বেগুনী (violet)। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল সেটা যেন আর বেগুনী থাকতে চাচ্ছে না—কালো কালো হয়ে আসছে। খানিক পরে দেখা যাবে আর সে কালো বেগুনী নেই—এবারে সত্যি সত্যিই সব কালো। যেতে যেতে আকাশ শুধু আঁধার কালোই দেখা যাবে, অন্য সব রংএর আর কোন চিহ্নও কোথাও নেই। আকাশে রয়েছে সূর্য্য, চাঁদ, তারা আর গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি। এগুলোকে আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, যেগুলো নীল সেগুলো আরও বেশী নীল। তারাগুলো আর আগের মত ঝিকি-মিকি ঝিকি-মিকি করছে না, তাদের সে অস্থির ভাব যেন কেটে গেছে—এখানে দেখা যাচ্ছে শান্ত সুবোধ ছেলের মত স্থির, অটল। শুধু আলোই দেখা যাচ্ছে; আর কিছুই নয়।

চাঁদেও তেমনি—আবছা আবছা বলে কিছুই নেই। সবই পরিষ্কার, দিনের আলোয় সারা দিক জ্বলজ্বল করছে। মেঘ, ধূলো-বালি কি অন্য কিছুর নামগন্ধও নেই যে চোখের সামনে

এসে একটা বাধা খাড়া করে রাখবে—যেদিকে তাকাও শুধু ধু-ধু করছে কতকগুলো পাহাড়, কতকগুলো খাদ আর সব দিকে মোড়ান আগ্নেয়গিরির ছাই। কোথাও এতটুকু ছায়ার নাম-গন্ধও নেই—শুধু চোখ-ঝলসান রোদ ছুরির মতই বিঁধছে।

তোমরা যদি দিনের বেলায় পৌঁছে যাও তা'হলে দেখবে দিন যেন আর কিছুতেই ফুরুতে চাচ্ছে না। কত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে খেলাধূলায়, চাঁদের দৃশ্য দেখে, কিন্তু দিনের আর শেষ নেই! গরমের ছুটির দিনগুলোই কি বড় বড়, খেয়ে ঘুমিয়ে খেলে বেড়িয়ে কাটতেই চায় না, এ যেন তার চেয়ে অনেক বড়। হবে না কেন তাই বল! আমাদের পৃথিবীতে খুব বড় দিন বড় জোর চৌদ্দ ঘণ্টা, কিন্তু এখানে বড় ছোট বিশেষ নেই, প্রায় সব সমান—তবে তাদের বছরও ছোট নয়। চৌদ্দকে উনত্রিশ দিয়ে গুণ করলে যে কতকগুলো ঘণ্টা পাওয়া যাবে চাঁদের এক একটা দিনও তত ঘণ্টা অর্থাৎ আমাদের এখানকার সম্পূর্ণ উনত্রিশটা দিনে চাঁদের একটা দিন হবে —প্রায় একমাস আর কি! ধর না তোমাদের পুরো গরম ছুটিটাই একটা দিন আর কি! তোমাদের হয়ত ভয় হচ্ছে তা'হলে রাতের মুখ আর এখানে দেখা যাবে না। দিন যখন এত বড় তখন রাত ত সেই অনুপাতে ছোট হবে নিশ্চয়ই। আষাঢ় মাসে যখন দিনগুলো খুব বড় হয়—এত বড় যে, কিছুতেই কাটতে চায় না, তখন রাতগুলো এত ছোট হয়ে

পড়ে যে, ঘুমিয়ে একটুও সুখ পাবার যো নেই। শুতে না শুতে কখন যে ভোর হয়ে যায়, বাবা উঠে বকাবকি সুরু করেন তখন পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার জন্যে, অথচ ঘুম তখনও চোখ জুড়ে রয়েছে —কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। এমন যদি চাঁদেও হয় তা'হলে আর মজা হ'ল কি? রাত বলতে আর কিছু থাকবে না— হয়ত দু ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা! সত্যি কিন্তু তেমন ভয় পাবার কিছু নেই। চাঁদেও যে পৃথিবীর মতই সব জিনিস হয় না সে ত দেখতেই পাচ্ছ। এ দিন-রাত হওয়ার বেলায়ও সেটার কমতি হয় নি। দিন যত বড় রাতও ঠিক তত বড়ই—কেউ কারুর চেয়ে খাট নয়। কোন রকম করে যদি দিনটা কাটিয়ে দিতে পার তা'হলে যত ইচ্ছা রাতে ঘুম দিও কেউ তোমাকে বকবে না বরং অতক্ষণ ঘুমোতে পারলে হয়।

এক মাস দিন আর এক মাস রাত—সে আমাদের দেশেও বিশেষ অজানা নয়। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে ত ছয় মাস রাত আর ছয় মাস দিন। তাই দিন-রাত নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে—সে না হয় কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু আর একটা বিষয় হ'ল গরম আর শীত। দিনের বেলায় সূর্য্যের আলো সোজা এসে পড়ছে—কোথাও বাধা দেওয়ার এতটুকু কিছু নেই, তাই রোদের তেজও হবে ভীষণ। আর রাতের বেলায় ঠিক তার উল্টো—কনকনে শীত। দিনের বেলায় রোদ যতই হোক না কেন সে হয়ত সওয়া

যায়, কিন্তু রাতের বেলায় যা শীত সে তোমরা এখান থেকে কল্পনাও করতে পারবে না। শীতটা কেমন হবে একবার ভেবে দেখ। আগেই তোমরা দেখেছ এখানে বাতাস না থাকার জন্যে গ্রহণের সময় সামান্য সময়ের মধ্যেই চাঁদের ঢাকা পড়া অংশ কি ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। এমনি যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন সূর্য্যের দেখা না পাওয়া যায় তা'হলে ব্যাপারটা কেমন ভয়াবহ হয়ে উঠবে সে নিজেরাই ভেবে দেখ। সূর্য্যই ত গরমের আধার, সূর্য্য না থাকলে আর গরম আসবে কোত্থেকে? সেই সূর্য্যের তিন মিনিট অদর্শনে যার তাপ শূন্যেরও দেড়শ ডিগ্রী নীচে নেমে যায়, তার ক্রমাগত দিনের পর দিনের অনুপস্থিতিতে, ব্যাপারটা বেশ সঙ্গীনই হয়ে উঠে। সেইজন্যেই বলছিলুম, ঘুমোতে পারলে হয়—আমাদের এই র‍্যাগ, লেপ, কাঁথায় কুলোলে হয়।

ওখানে যেয়ে আর একটা জিনিস যদি জেনে আসতে পার তা'হলে কিন্তু খুব বাহবা নিতে পারবে: চাই কি মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক বলেই তোমাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়। তোমরা চাঁদ মামার যে সব কথা শুনছ সবই কিন্তু একতরফা। পণ্ডিতেরা বলেন চাঁদ মামা সব সময়েই আমাদের দিকে একটা পিঠ ফিরিয়ে রয়েছেন। আর ঘুরে ফিরে দাঁড়াচ্ছেন না—তাই আমরা অন্য পিঠের কোন সংবাদই জানি না। এই যে জল,

বাতাস, পাহাড় যাদের খবর আমরা পাচ্ছি এসবই এর একই গোলার্দ্ধের খবর। তোমরা ম্যাপে দেখে থাকবে আমাদের পৃথিবীর ম্যাপ দেওয়ার সময় তুটো ম্যাপ দেওয়া হয়—একটা পশ্চিম গোলার্দ্ধের আর একটা পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের। চাঁদের ম্যাপ যে তৈরী করা হয়েছে সেটা শুধু একই গোলার্দ্ধের, কারণটা অবশ্য বিশেষ কিছু নয়। কারণ কি জান? চাঁদ মামা নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরে আসতে যত সময় নেন, পৃথিবীর চারদিক ঘুরে আসতেও তত সময়ই নেন। তাই আর আমরা অন্য পিঠ দেখবার সুযোগ পাই নে। তোমরা যখন যাচ্ছ তখন একটু কষ্ট করে ঐ পিঠে গেলে সব খবরই জানতে পারবে।

সেটা না হয় পরে হবে, এখন এর আশেপাশের খবরটা ত ভালভাবে নেওয়া দরকার, 'কি বল? দিন-রাতের খবর ত পেলে—এক একটা আমাদের দেশের এক এক মাসের সমান। এই দিন-রাতের বেলায় আমাদের পৃথিবীর সাধারণ দিন-রাতকে এমনি টপকে গেলেও অন্য দিক দিয়ে কিন্তু চাঁদ মামা সব কিছুতেই ছোট। তোমাদের যদি ধৈর্য্য থাকে—না থাকারও বিশেষ কোন কারণ নেই, অবসর ত অফুরন্ত, সময় কি করে কাটাবে তারই ভাবনা—এর চারদিক মাপ-জোঁক করে দেখতে পার। আমাদের পৃথিবী আর চাঁদ তুটোকেই যদি গোলাকার ধরে নেওয়া যায়—পৃথিবীর তুদিকে একটু

চ্যাপ্টা আছে বটে তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না—তা'হলে দেখবে পৃথিবীর ব্যাস চাঁদের ব্যাসের প্রায় চারগুণ। অঙ্কের হিসেবে পৃথিবীর ব্যাস হ'ল ৭৯১৪ মাইল আর চাঁদের হ'ল ২১৬০ মাইল। তার মানে হ'ল পঞ্চাশটা চাঁদকে একত্র করলে তবে পৃথিবীর সমান হবে। বুঝতেই পারছ এদিক দিয়ে চাঁদ মামার দেশ কত ছোট! একটা আধটা নয়, আধ'শ চাঁদ এক সঙ্গে হয়ে তবে আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে টেক্কা দিতে পারবে। তবে অন্য দিকে অত ছোট নয়। আয়তনে পৃথিবীর উপরিভাগটাকে প্রায় ধর ধর করে নিয়েছে বলে বলা চলে। আয়তনে পৃথিবী মাত্র তেরগুণ বড়। এটা কিন্তু কম কথা নয়, কি বল? কোথায় পঞ্চাশের ধাক্কা আর কোথায় তের মাত্র। চাঁদ মামার দেশ আমাদের পৃথিবীর ইউরোপ আর আফ্রিকা বা দুটো আমেরিকা এক এক সঙ্গে করলে—দ্বীপ উপদ্বীপগুলো অবশ্য বাদ দিয়ে—যতটা হয় প্রায় ততটা। তা মন্দ কি, অত ছোট্ট চাঁদে এত জায়গা। আমাদের এক ইউরোপই আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের জোরে যা করছে যদি ওখানকার অধিবাসীরাও ঠিক এমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হয় তা'হলে তারা কত কিই না করতে পারে। হয়ত বা আমাদের পৃথিবীতেই একদিন হানা দিয়ে বসবে—তা'হলে কিন্তু বড় মুস্কিলের কথা হবে, কি বল?

তোমরা হয়ত আশ্চর্য্য হচ্ছ, এত কথাই শোনা যাচ্ছে,

কিন্তু সত্যি চাঁদ মামার দেশে আমাদের মত মানুষ কেউ আছে কিনা তার কোন খবরই ত শোনা গেল না। হয়ত ভাবছ জল-বাতাসের খবর নেওয়া গেল এখানে বসেই, পাহাড়-পর্ব্বতে কি হচ্ছে তাও জানা গেল, অথচ মানুষের সংবাদ কিছু আর নেওয়া গেল না? অনেক কিছুই ত চাঁদের বিষয় শুনলে। এখন কি মনে হয় সত্যই সেখানে কারুর দেখা পাবে—মানুষের মত হাত-পা-চোখ-ওয়ালা—ঠিক মানুষের মত মন প্রাণ শরীর নিয়ে? মামা না হোক, মামাদের সগোত্রের কেউ? ভেবে দেখ মানুষের মত কারও চাঁদে বাস করা সম্ভবপর কিনা। আমাদের প্রতিদিনকার দরকারী জিনিসগুলোর কথা বিবেচনা করা যাক্। ধর বাতাস,—তোমাদের মধ্যে কে কতক্ষণ বাতাস না নিয়ে নাক-মুখ বন্ধ করে থাকতে পার পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝবে। কেউ বা আধ মিনিট, কেউ বা এক মিনিট, বড় জোর দু' মিনিট, তার বেশী কেউ না। এই বাতাস যদি এখনি বন্ধ হয়ে যায় তা'হলে কেমন হয় ভেবে দেখত! জলের কথা ধরা যাক্। জল না পান করে কতক্ষণ থাকতে পার? খুব বেশী হলে এক দিন, দু'দিন, তার পরে যে তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি সুরু হবে সে ঠিকই। চাঁদে জল-বাতাসের যে দুর্ভিক্ষ, এখানে আমাদের মত মানুষের বাঁচা কিছুতেই সম্ভবপর কি? এখানে যে আমাদের সগোত্রের কারুর দেখা পাবে সে আশা নেই। তবে অন্য কোন জীব

যাদের জল-বাতাসের কোন দরকার হয় না—থাকলেও থাকতে পারে ! তাদের সঙ্গে পৃথিবীর কারুর চাক্ষুষ পরিচয় নেই। কারুরই নেই,- বড়, বড় বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পণ্ডিত রাজনৈতিক সাধু সন্ন্যাসী অলি দরবেশ যাই কেন বল না—এমন কারুর সঙ্গেই বোধ হয় পরিচয় নেই। ভূত-প্রেত, দেব-দৈত্য, জিন-পরী এমন অনেক অশরীরীদের কথাই হয়ত শুনে থাকবে ; তাদের কারুর সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় কারুর আছে কিনা সেটা খুবই সন্দেহজনক। তারাই কেউ এই চাঁদে বসবাস করে কিনা তা বলা যায় না। তবে একটা কথা, এদের সম্বন্ধে এমনি যতই গল্প শোনা যাক্ না, এদের জল-বাতাসের যে দরকার হয় না তা কোন দিনই শোনা যায় না। এখানে ত এদের ছায়াটাও দেখা যায় না, ওখানে যদি দেখতে পাও তা'হলে সব কিছু জেনে নিতে চেষ্টা ক'রো। পৃথিবীর মত গাছপালাও যে সেখানে পাবে না সেটাও স্বতঃসিদ্ধ। জল-বাতাস না থাকলে মানুষের মত এদেরও বাঁচা অসম্ভব, সে কথা হয়ত তোমরা জান। তাই এদের মতও কারুর চাঁদে দেখা পাবার আশা নেই। দেখা যাচ্ছে, চাঁদ মামার দেশে মামাদের নামগন্ধও নেই ; তবুও চাঁদ মামা—হাসির কথা বটে।

মঙ্গলের রাজ্য

চাঁদ মামার দেশের খোঁজ-খবর নেওয়া গেল। দেখা যাচ্ছে এঁর সঙ্গে কারবার করা বিশেষ সুবিধের নয়। উনি যে এমনি ভাবে হতাশ করবেন তা আর কে জানত? দেখতে এমন সুন্দর, জ্যোছনায় যখন হাসতে থাকেন, তখন মুখ দিয়ে যেন মুক্তো ঝরে সেই পরীর দেশের রাজকন্যার মতই; কিন্তু ভিতরে যে ওঁর এমনি ছাই-পোরা সে আর কে ভাবতে পেরেছিল? উনি লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে আছেন তাই ভিতরের খবর সহজে জানতে পারা যায় নি, এখন দেখা যাচ্ছে মাকাল ফলের সঙ্গে আসলে এঁর পার্থক্য আছে খুব কমই— শুধু উনি আছেন আকাশের গায়ে আর মাকাল ফল আছে পৃথিবীর মাটিতে, এই আর কি! যাক্ এঁকে ছেড়ে দিয়ে আর দু-এক জনের খোঁজ-খবর নেওয়া যাক্। একবার যখন ঘর ছেড়ে বেরোনর পথ পাওয়া গেছে, তখন আর দু-এক জনের সংবাদ না নিয়ে অমনি অমনি ফিরে যাওয়া চলবে না— লোকে টিটকারী দেবে যে!

চাঁদ মামার দেশ থেকে বেরিয়ে পড়া যাক্। ঠিক যেমন করে পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসা গেছে, এখান থেকেও তেমনি করেই বেরোতে হবে, তবে একটু সাবধানে। পৃথিবী যখন

দূরে থাকেন তখনই এই যাত্রার বন্দোবস্ত করতে হবে, নইলে তাঁর টানটাকে কিছুতেই এড়ান যাবে না, আবার ফিরে যেতে হবে একেবারে তাঁর কোলের মধ্যে।

চাঁদ থেকে বেরোলেই পাওয়া যাবে পরিচয়হীন শূন্য রাজ্য—এ যেন এক অনন্ত সমুদ্র। তবে এতে জল নেই বা তার কলকল শব্দও নেই; আছে শুধু ভীষণ নিস্তব্ধতা, দুর্ব্বোধ্য নীরবতা। একটুও বাতাস নেই, শব্দ নেই, চারদিক-ঘেরা ভীষণ অন্ধকার। অমাবস্যার রাতের মতই এ অন্ধকারে চোখে আঙ্গুল দিতেও যেন ভয় করে। সেই অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে দূরে অতি দূরে অনেকগুলো আলো। এ আলোও এক রকমের নয়—বরং নানা রকমের, নানা আকারের, নানা রংএর। কেউ জ্বলছে দপ-দপ করে—যেন অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি, আবার কেউ বা জ্বলছে নিস্তেজভাবে—যেন বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। আর কেউ বা রয়েছে দুয়ের মাঝামাঝি, খুব বড়ও নয় খুব ছোটও নয়, মধ্যবিত্তদের মত কোন রকমে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে। গর্ব্বিত ভঙ্গীও নেই, বিনীত মাথা নোয়ানও নেই। এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। পৃথিবীতে এমনি দৃশ্য দেখতে পাবে না। এখানে বাতাস রয়েছে, গাছপালা রয়েছে, শ্যামলা বনানী রয়েছে, আরও রয়েছে নানা রকমের পশু-পক্ষী জীব-জন্তু, কিন্তু এ অনন্ত সমুদ্রে তাদের বিন্দুবিসর্গেরও নামগন্ধ নেই। তবে এই দূর-অদূরের আলোর একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে অন্ধকার রাত্রিতে কোন

নির্জ্জন বিলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আশ-পাশের গ্রামগুলোর দিকে তাকালেই। সব দিক অন্ধকারে ঘেরা, শুধু দূর-অদূরের গ্রামগুলোতে দু' একটা আলো দেখা যাচ্ছে। কাউকে বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে অনেকটা কাছে আছে, কারুর খোঁজ পাওয়া যায় অনেক কষ্টে, স্পষ্টই মনে হয় সেগুলো আছে অনেক দূরে।

যাক্, এই অনন্ত শূন্যের মধ্যে যাঁরা আমাদের বাড়ীর কাছে আছেন, তাঁদেরই খোঁজ নেওয়া যাক্। এঁরা আছেন খুবই নিকটে—আমাদের পৃথিবীর পাড়া-প্রতিবেশী আর কি! এই শূন্য রাজ্যের অনেক কিছুরই যেমন আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে মিল বড় একটা নেই, পাড়া-প্রতিবেশী, দূর-অদূরের সংজ্ঞা নিয়েও তেমনি একটু মুস্কিল আছে। তোমাদের হয়ত মনে হচ্ছে পাড়া-প্রতিবেশী যখন—তখন আর কি? হয়ত বা তিন শ গজের মধ্যেই সবার দেখা পাওয়া যাবে। আর এই শূন্য রাজ্যের ব্যাপারের জন্য যদি কোন গোলমালই হয়, তা'হলে না হয় তিন শ গজের জায়গায় মাইল দু-তিনেকের ব্যাপার হবে। আমরা যখন তিন শ গজের মধ্যে থাকলেই প্রতিবেশী বলি, এঁরা না হয় সেখানে তিন মাইলের মধ্যে যাঁরা থাকেন তাঁদেরকেই প্রতিবেশী বলবেন।

তোমাদের একটা কথা আগে থাকতেই বলে রাখছি। এই শূন্য রাজ্যে এক-দুই মাইল, এক শ-দু'শ মাইল কিংবা হাজার-দু'হাজার মাইলের কথা মনেও এনো না। হাজার

দিয়ে কোন কারবারই নেই এখানে ; এখানে শুধু লাখ-কোটির ব্যাপার। লাখের নীচে যেগুলো আছে, তাদের কথা মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে দেবে। ও কিছু না, এত সামান্য যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। ওসব গণনার মধ্যেই আনতে নেই। লাখকেও যে বিশেষ কেয়ার করতে হবে তা নয়, তবে একেবারে ফেলে না দিয়ে মাঝে মাঝে একটু মনে রাখা আর কি! এই ধর না চাঁদের কথা। এই শূন্য রাজ্যে চাঁদ মামাকে বলতে হবে আমাদের বাড়ীর লোক। তিনি যেন ঘরের বারান্দায় বসে আছেন আর আমরা ভিতরে—এমনি আর কি! তিনি এত কাছে আছেন যে, আমাদের নিঃশ্বাস পড়লেও শুনতে পারেন। তবুও এই কাছে মানে কত কাছে সে হয়ত তোমাদের মনে আছে। তিনি আছেন আমাদের থেকে আড়াই লাখ মাইল দূরে। পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে যে প্রতিবেশী—শুক্র, তিনি আছেন আড়াই কোটি মাইল দূরে ; তার চেয়ে একটু দূরে আছেন মঙ্গল—তাঁর দূরত্ব প্রায় পাঁচ কোটি মাইল। তার চেয়ে আর একটু দূরে আছেন বৃহস্পতি, তিনি রয়েছেন উনচল্লিশ কোটি মাইল দূরে। আর একটু বেশী দূরে আছেন শনি—উনআশী কোটি মাইল দূরে। এমনি কোটি কোটি মাইলের ব্যাপার রয়েছে এখানে। নেপচুন আছেন দু'শ উনসত্তর কোটি মাইল দূরে। সব চেয়ে দূরে রয়েছেন প্লুটো—তিনশ ছিয়ানব্বই কোটি মাইল দূরে।

তোমাদের হয়ত মনে হচ্ছে—এ যে দেখছি একেবারে বেয়াড়া। এই কোটি কোটি মাইল দূরে যারা রয়েছে, তাদেরকেই যদি বলতে হয় পাড়া-প্রতিবেশী তা'হলে আর দূরে রইলেন কে, প্রতিবেশীই বা নয় কে, শূন্য রাজ্যে সবাই হয়ত পাড়া-প্রতিবেশী। না, তাও ঠিক সত্যি নয়। পণ্ডিতেরা কি বলছেন জান? তাঁরা বলেন, এমনি পাঁচ-সাত শ কোটি মাইলের মধ্যে যাঁরা তাঁদের বাড়ী-ঘর নিয়ে পৃথিবীর আশে পাশে রয়েছেন —যাঁদের পাড়া-প্রতিবেশী বলা হয়, তাঁদের সংখ্যা মাত্র আট। আর যাঁরা আছেন, তাঁদের আর কিছুতেই এমনি পাড়া-প্রতিবেশীর আওতায় ফেলা চলে না। পাঁচ-সাত শ কোটি মাইল কেন, হাজার কোটি মাইলের মধ্যেও তাঁদের দেখা পাওয়া যাবে না—এঁরা কত দূরে দূরে আছেন তার একটা আভাস তোমাদের দিচ্ছি, তা'হলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কেমন।

তোমরা হয়ত জান আলো প্রতি সেকেণ্ডে চলে এক লাখ ছিয়াশী হাজার মাইল অর্থাৎ প্রায় দু'লাখ মাইল আর কি! তার এক কোটি মাইল যেতে লাগবে সেকেণ্ড পঞ্চাশেক অর্থাৎ এক মিনিটও নয়, ধরা যাক্ মোটামুটি এক মিনিট। তার অর্থ ঘণ্টায় ৬০ কোটি মাইল! এমনি যার গতি সে আলোও ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়ে সোয়া চার বৎসরে অর্থাৎ সাড়ে পনের'শ দিনে আমাদের কাছে এসে পৌঁছুবে—আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীর

আওতার বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যেও আবার যিনি নিকটতম তাঁর কাছ থেকে। বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা কেমন! তিনি এতদূরে আছেন যে, সেটা কল্পনা করাও মুস্কিল। যদি অঙ্ক কষ, তা'হলে দেখবে কতগুলো শূন্যের ছড়াছড়ি—অথচ ইনিই হলেন সবচেয়ে নিকটে। এর সঙ্গে শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি শনি প্রভৃতির তুলনা করলে এদের পাড়া-প্রতিবেশী বলে মনে হবে না কি? মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগবে পাঁচ মিনিটের মত সময়, বৃহস্পতি থেকে লাগবে আধ ঘণ্টার একটু উপর, শনি থেকে লাগবে সোয়া ঘণ্টা খানেক আর তার চেয়ে দূরে আছেন যিনি, সেই নেপচুন থেকে আসতে লাগবে সাড়ে চার ঘণ্টার মতন। কোথায় মিনিট ঘণ্টার ব্যাপার আর কোথায় হাজার হাজার দিনের ব্যাপার! বুঝতেই পারছ, এদেরকে শূন্য রাজ্যের পাড়া-প্রতিবেশী বললে বেশী দোষ হবে না। আর চাঁদ—চাঁদ থেকে আলো আসতে দু'সেকেণ্ডও লাগবে না। তা'হলে তাঁকে ঘরের লোক বলা চলে না কি?

আমাদের পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী আছে দুইজন। শুধু প্রতিবেশীই নয়, আকারে-প্রকারে, চাল-চলনেও প্রায় পৃথিবীর মতই। এর একজন হ'ল শুক্র, আর একজন মঙ্গল। শুক্রই অবশ্য বেশী কাছে, তবে সূর্য্যের খুব কাছাকাছি, তাই তার গরমটাও বেশী। আদি সৃষ্টির

ব্যাপারটা মনে করলেই হয়ত কথাটা আরও ভাল করে বুঝে উঠতে পারবে। অনন্ত বিশ্বের অন্তের কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের সূর্য্য আর পাড়া-প্রতিবেশীদের কথাটাই বিবেচনা করা যাক্।

প্রথমে সূর্য্য ছিলেন আজকালকার চেয়ে আরও জ্বলন্ত, আরও ভীষণ; অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছেন! তাঁর এই ঘোরাঘুরির জন্যে তাঁর মধ্য থেকে কতক অংশ ছিটকে পড়তে লাগল—একটা কাদার পিণ্ডকে ধরে ঘুরালে যেমন হয়ে থাকে আর কি! যারা ছিটকে পড়ল, তারা কিন্তু একেবারেই ছিটকে দূরে যেতে পারল না। আদুরে ছেলে যেমন মায়ের উপর রাগ করে চলে যেতে চাইলেও মা ছেড়ে দেন না, হাত দিয়ে আগলে রাখেন—একেবারে কোলের মধ্যে টেনেও নেন না আবার একেবারে ছেড়েও দেন না, সূর্য্য এঁদের বেলায়ও সেই পথই অবলম্বন করেছেন। এঁরা ছিটকে দূরে সরে যেতে চাইলেও সূর্য্য এঁদের যেতে দেন না, নিজের দিকে একটু টেনে রাখছেন। আর এঁদেরও একেবারে চলে যাওয়া হচ্ছে না; ফলে হয়েছে এই ঘুরপাক খাওয়া। যদি কোন দিন সূর্য্য কারুর উপর বীতরাগ হয়ে এই টানকে একবার আলগা দেন তা'হলে তাকে আর দেখতে হবে না, শূন্য রাজ্যের কোথায় যে তার স্থান হবে কেউ তা বলতেও পারে না। যাক্, এই ছিটকে যেতে কেউ একটু বেশী জোরে যাওয়ার জন্যে একটু

দূরে যেয়ে পড়ল, কেউ কম জোরে যাওয়ার জন্য কাছেই রইল ; তবে সবারই ঘোরাঘুরি চলতে লাগল সূর্য্যকে কেন্দ্র করে। সূর্য্যের অতি নিকটে রইল বুধ ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে, তার পরে শুক্র ৬ কোটি ৭২ লক্ষ মাইল দূরে, তার পরে আমাদের পৃথিবী ৯ কোটি ২৯ লক্ষ মাইল, তার পরে মঙ্গল ১৪ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল। দেখা যাচ্ছে আমাদের আশে-পাশে রয়েছে শুক্র আর মঙ্গল। ওপারে সূর্য্যের কাছে ঘেঁসে শুক্র আর এপারে মঙ্গল।

এই যে যারা ছিটকে পড়ল, এদের নিজের বলতে কিছু নেই। প্রথমে ত যা এসেছে সে সূর্য্য থেকেই, তারপরেও এদের নির্ভর করতে হচ্ছে সূর্য্যের উপরেই অনেক কিছুর জন্যে। এই ধর না গরমের কথাই। গ্রীষ্মের গরমে যতই হাঁই-পাই করি না কেন, এ গরম একেবারে না থাকলে ত আর চলত না, ঠাণ্ডায় জমে কাঠ হয়ে যেতে হ'ত। এই গরম কিন্তু এদের নিজেদের খুব কমই আছে, প্রায় সবটার জন্যেই সূর্য্যের উপরেই নির্ভর করতে হয়। সূর্য্য ত আর কৃপণ নয়, সব সময়েই তিনি তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন, রোদ আলো সবই সমানভাবে দিয়ে যাচ্ছেন। যারা কাছে কাছে আছে তারা সবই বেশ পাচ্ছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যারা বেশী দূরে গিয়েছে তাদের যার কপালে যা পড়ে। বুঝতেই পারছ, যারা বেশী রাগ করে বেশী দূরে গিয়েছে—তারা ফলও ভোগ করছে

তেমনি। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, শুক্রের গড় উত্তাপ আমাদের পৃথিবীর গড় উত্তাপের চেয়ে প্রায় নব্বই ডিগ্রী বেশী আর মঙ্গলটা দূরে রয়েছে, ওখানে আর এত গরম নেই, আমাদের পৃথিবীর মতও গরম নেই—বরং অনেকটা ঠাণ্ডাই বলতে হবে।

চাঁদে রওনা হওয়ার আগেই যেমন সেখানকার অনেক বিষয় জেনে নেওয়া গেছিল, এখানেও সে রকম করলে মন্দ হয় না। এখানে সুবিধে-অসুবিধের কথা বাইরে থেকে অন্ততঃ আভাসে যতটা জানা যায়, সেই ভাবে যোগাড়যন্তর করে রওনা হওয়াই ভাল; কি বল? কোথায় হঠাৎ কি দরকার হয়ে পড়ে তার ঠিক নেই। একেবারেই অজানা ভাবে গিয়ে দায়ে ঠেকার চেয়ে জেনে শুনে যতটা পারা যায় সামলিয়ে নিয়ে যাওয়াই সুবিধে। চাঁদ মামার দেশের জলবায়ুর কথা আমরা আগেই জেনে নিয়েছিলুম, তাই সেজন্যে বিশেষ বন্দোবস্তও করা গিয়েছিল। এই মঙ্গলের রাজ্যেও জলবায়ুর তেমনি দুর্ভিক্ষ কিনা, পাহাড়-পর্ব্বত খাদের তেমনি প্রাদুর্ভাব কিনা, আগেকার মত জেনে নেওয়া চলতে পারে। তবে একটু অসুবিধে আছে। চাঁদ মামা শূন্য রাজ্যের কথায় আমাদের ঘরের লোক, অতি নিকটে। আর তাঁকে পাওয়াও যায় প্রায় প্রত্যেক দিন, তাই তাঁর বিষয় জানতেও বিশেষ কষ্ট হয় নি, কিন্তু এই মঙ্গলের বেলায় আর

ঠিক তা বলা চলে না। একে ত তিনি অনেকটা দূরেই রয়েছেন, তার পরে পাড়া-প্রতিবেশী হলেও, নিজের আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান তাঁর খুব কম নয়, তাই চাঁদ মামার মত সব কথা অত পরিষ্কারভাবে জানতে দিতে চান না।

প্রথমতঃ চাঁদের মত ইনি ঠিক একটা পিঠ বরাবর পৃথিবীর দিকে দিয়ে নেই। চাঁদের একটা পিঠ সব সময়েই এই দিকে থাকায় এই পিঠের খবরটা ভালভাবে জানতে খুবই সুবিধে হয়েছে, প্রত্যেক জিনিসটির সংবাদ অতি খুঁটিনাটি ভাবেই জানা গিয়েছে; তবে অন্য পিঠটার কোন সংবাদই জানা যায় নি। সে হিসেবে আমাদের একটু দুঃখ থাকলেও আসলে বিশেষ কিছু আসে যায় না। এক দিকেই যখন নিরাশ হতে হয়েছে তখন অন্য দিকে আর এমন কি ভাল থাকবে যে তার জন্যে মনমরা হতে হবে? মঙ্গল কিন্তু ঠিক চাঁদের মত নন। ইনি এক পিঠ বরাবর একদিক করে ত চলছেনই না বরং ঠিক পৃথিবীর মতই নিজের মেরুদণ্ডের উপরেই সব সময়ে ঘুরপাক খাচ্ছেন। তোমাদের আগেই বলেছি, এর চাল-চলন অনেকটা আমাদের পৃথিবীর মতই। এই ঘুরপাক খাওয়ার বেলায়ও তাই। তোমরা জান পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের চারদিকে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসছে, মঙ্গলও ঠিক এমনি করেই ঘুরছে, তবে তার সময় লাগে একটু বেশী—আধ ঘণ্টাটাক বেশী। তার লাগে মোটমাট ২৪ ঘণ্টা

৩৭ মিনিট ২৩ সেকেণ্ড। তার চলনটা একটু ধীরস্থির। তুমি আর তোমার ছোট ভাইটি কোথাও একত্রে যাওয়ার সময় যেমন তোমার ছোট ভাইটি প্রায়ই পিছিয়ে পড়ে, কিছুতেই তোমার সঙ্গে হেঁটে যেতে পারে না, এই পৃথিবী আর মঙ্গলেরও তেমনি অবস্থা। মঙ্গলটা যেন পৃথিবীর ছোট ভাই। পৃথিবীর সঙ্গে ঠিক সমান তালে ছুটে তাল রাখতে পারছে না, তাকে একটু পিছিয়ে পড়তেই হয়, তার একটু দেরীই হয়ে যায়। মঙ্গল গ্রহের দিনটা তা'হলে আমাদের দিনের চেয়ে একটু বড় হলেও বেশী বড় নয়—মাত্র আধ' ঘণ্টা। যাক্, বাঁচা গেছে, কি বল ? চাঁদ মামার দেশের দিন-রাতের মত নয়; সূর্য্য উঠলেন ত উঠলেন, ডোবার আর গরজ নেই, দিনেরও শেষ নেই; আবার ডুবলেন ত ডুবলেন—একেবারে নিশ্চিন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দাও, রাত আর ফুরোতেই চায় না। দিন-রাতের জন্য মঙ্গলে বড় একটা অসুবিধে ভোগ করতে হবে না তা ঠিকই, আমাদের চিরদিনকার জানাশোনা দিন-রাতের মতই। তবে আর একটা ব্যাপার হ'ল, ওখানকার ঋতুগুলো ঠিক আমাদের দেশের ঋতুর মত হবে না। আমাদের এখানে গরম দু'মাস, বড় জোর তিন মাস—৬০ দিন না হয় জোর ৯০ দিন। অসহ্য গরম হয়ত কিছুদিনের জন্য হলেও হতে পারে, কিন্তু কয়দিন আর ? নব্বই দিনের বেশী আর থাকতে পারে না, তারপর তাকে আপনিই সরে পড়তে হবে। শীতের

বিভিন্ন ঋতুতে মঙ্গলের ছবি

বেলাও তাই। দুরন্ত শীত, হাড়ভাঙ্গা শীত, সব যেন জমে যাচ্ছে; তখনই মনে হয়—আর কয়দিনই বা, একে যেতেই হবে, বেশী দিন আর দেখতে হবে না। এই মঙ্গলের রাজ্যে কিন্তু তা হবার উপায় নেই। এখানে যিনি আসেন তিনি কিছুদিনের জন্য স্থায়ী ভাবেই রয়ে যেতে চান। তার কারণও হ'ল পৃথিবীর এই ছোট ভাইটির মন্থর গতি।

তোমরা জান পৃথিবী সূর্য্যের চ.রদিকে একবার ঘুরে আসে ৩৬৫ দিনে; মঙ্গল কিন্তু তা পারে না। ছোট কিনা—তা ছাড়া সে রয়েছেও সূর্য্যের থেকে অনেক দূরে, তাই তার পথটাও হয়ে পড়েছে অনেক বড়। এই পথে তার ঘুরে আসতে লাগে অনেক দিন—মোট ৬৮৭ দিন; আমাদের পৃথিবীর প্রায় ডবল আর কি! এই দীর্ঘ পথ আর মন্থর গতি—খোদাতালা তাকে এই দুটো অসুবিধে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, আরও কতকগুলো অসুবিধে তার আছে—যে জন্যে তার দেশে এই শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুগুলোর উৎপাত একটু বেশীই হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমাদের কাছে এগুলো বিশেষ অসুবিধাজনক মনে হলেও সেখানকার লোকেরা যে একে তেমন অসুবিধের মনে করে, এরূপ ভাববার কোন কারণই নেই। আমাদের এই পৃথিবীতেই ভারতবর্ষ আর ইংল্যাণ্ডের কথা ধর না কেন। আমাদের এখানে গরম একটু বেশী, কিন্তু সেজন্যে আমাদের কি আর খুব অসুবিধে হয়? তবে ইংল্যাণ্ড থেকে যে ইংরেজেরা

এদেশে আসে তারা এ গরম তেমন সহ্য করতে পারে না। প্রথম প্রথম আবার ইংরেজদের দেশের যে শীত আমরাও তা খুব পছন্দ করি না, কিন্তু সেখানকার লোকগুলো ত দিব্বি আরামে কাটিয়ে দিচ্ছে—তাদের যে খুব অসুবিধে হয়, তা ত মনে হয় না।

আরও যে অসুবিধে মঙ্গলের আছে সে জেনে রাখা মন্দ হবে না। প্রথম ধরা যাক্ পথের কথাই। আমাদের পৃথিবী যে পথে সূর্য্যের চারদিক ঘুরছে সেটা অনেকটা গোলাকার। দু' দিকে সামান্য একটু লম্বা রকমের আছে বটে, কিন্তু সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনলেও চলে। তাই সূর্য্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সব সময়েই প্রায় একই রকমের থাকে সামান্য একটু কম বেশী হয়। অবশ্য শূন্য রাজ্যের পরিমাণ হিসেবে একে সামান্য বলছি, আমাদের পৃথিবীর মাপ অনুসারে এ হবে ৩০ লক্ষ মাইলের ধাক্কা ; অর্থাৎ পৃথিবী যখন ঘুরতে ঘুরতে সূর্য্যের খুব কাছে এসে যায় তখনকার দূরত্ব এবং আবার যখন ঘুরতে ঘুরতে সব চেয়ে বেশী দূরে চলে যায় তখনকার দূরত্ব—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হ'ল প্রায় ৩০ লক্ষ মাইল। এ যে খুব কম নয় তা ঠিকই, তবে শূন্য রাজ্যে একে বাদ দিলেও বিশেষ ক্ষতি কিছু নেই। মঙ্গলের বেলায় এটা ঠিক অন্য রকম হয়ে পড়েছে। তার পথটা আরও অনেকটা বেশী রকমের ডিম্বাকৃতি। তাই তার সূর্য্য থেকে নিকটতম স্থান আর দূরতম স্থানের

পার্থক্যও দাঁড়িয়ে গেছে অনেক বেশী—পৃথিবীর চেয়ে প্রায় আট গুণ—দুই কোটি ষাইট লক্ষ মাইল। এ থেকেই বুঝতে পারছ মঙ্গল গ্রহ যখন ঘুরতে ঘুরতে সূর্য্যের খুব কাছে এসে যায় তখন তার সমস্ত অংশটাই একটু বেশী গরম হয়ে পড়ে, আবার যখন দূরে সরে যায় তখন একটু বেশী ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে; তার সাধারণ ঋতু-বৈচিত্র্যের উপর এ আবার আর এক উৎপাত। শুধু এই দূরত্বই নয়, ঘোরবার সময় এর মেরুদণ্ডটা সূর্য্যের দিকে সোজা না থেকে একটু বেশী রকমের বাঁকা হয়ে থাকে। পৃথিবীর বেলায় এ বাঁকটুকু হ'ল ২৩° ডিগ্রী, অথচ এর বেলায় ২৫° ডিগ্রী। এই সবের জন্যই এই ঋতুগুলোরও উৎপাত। এ উৎপাতের ধরণ তোমরা একটা কথাতেই বুঝতে পারবে। এর উত্তর গোলার্দ্ধে গ্রীষ্মকাল হ'ল ৩৮১ দিন ধরে; অর্থাৎ আমাদের পূর্ণ এক বৎসরেরও বেশী সময় ধরে এখানে গরম। প্রাণটা হয়ত গরমের চোটে আইঢাই করছে তবু রক্ষে নেই—গরম চলেছে ত চলেছেই, কবে যে এর শেষ হবে তার কোন ঠিকই নেই। আবার গরম যেয়ে যখন শীত পড়া সুরু করল তখন তেমনি অবস্থা। শীত চলেছে ত চলেছেই! ৩০১ দিন ধরে শুধু শীত। শরীর জিড়-জিড় হয়ে গেল, তবুও এর শেষ নেই।

তোমাদের আগেই বলেছি, মঙ্গল সব সময়েই ঘুরছে পৃথিবীর মত। এই ঘোরার জন্যে তার কোন একটা

জায়গা বেশীক্ষণ ধরে দেখবার সুবিধে হয় না। হয়ত বসে বসে দূরবীক্ষণ দিয়ে তুমি একটা জায়গার দিকে লক্ষ্য করছ ; একটু দেখতে না দেখতে সে জায়গাটা গেল সরে, তার জায়গায় এল অন্য একটা জায়গা নিজের মূর্ত্তি নিয়ে—হয়ত বা আগেকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, হয়ত বা অন্য কোন রকমের, আগেরটার সঙ্গে যার কোন সম্বন্ধই নেই। তোমার আগেকারটা ভাল করে দেখাই হ'ল না। এই অসুবিধে থাকলেও অন্য দিক থেকে কিন্তু বেশ সুবিধে হয়েছে। সেটা হ'ল এই যে, সব স্থানের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় হবার সুযোগ হয়ে গেছে—চাঁদের মত এক পিঠ দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে না। এখন হয়ত তুমি একটা পিঠ দেখা সুরু করেছ, বার ঘণ্টা পরে ঠিক এর অপর পিঠটাও তোমার চোখের সামনে এসে পড়বে।

দিন-রাতের খবর ত পাওয়া গেল, সেদিক দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। এইবার এর ভিতরে কি আছে তার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক্। পথ ত জানাই আছে। চাঁদের বেলায় যেমন করা গেছিল, এখানেও ঠিক তেমনি করেই ফটো তুলে নিয়ে বড় করে দেখতে হবে, কি ব্যাপার! ফটোতে দেখবে, চাঁদে যেমন কলঙ্ক বা কালো কালো দাগ আছে, মঙ্গলেও তেমনি অনেক দাগ আছে। তোমাদের হয়ত মনে হচ্ছে, এ ত আশ্চর্য্য

ব্যাপার। আকাশে মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে কোন দিনও এতে এতটুকু দাগ দেখতে পাওয়া যায় না, বরং এ যেমন উজ্জ্বল তাতে এতে যে কোন দিন আবার চাঁদের মতই বুড়ী বা খরগোসের খোঁজ পাওয়া যাবে তা কল্পনা করাই অসম্ভব—তবুও এখানে এত দাগ! তোমাদের কথা ঠিকই, তবে এখানেও সেই দূরত্বের কথাই ভেবে দেখ। অনেক দূরে আছে বলেই খালি চোখে আকাশে তাকিয়ে এদের একটুও পাত্তা পাওয়া যায় না, কিন্তু দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখলেই সব স্পষ্ট দেখা যায়। এই দাগগুলো ভাল করে দেখে দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। দেখবে কতগুলো যেন ধূম্রবর্ণের—অনেকটা সবুজের কাছাকাছি, আর কতকগুলো হচ্ছে গাঢ় হলদে বা কমলালেবুর রংএর মত; সময় সময় আবার একেবারে সাদা। এগুলো যে কি—এ নিয়ে কিন্তু বেশ মজা লেগে গেছে। প্রথম প্রথম ত বৈজ্ঞানিকেরা বললেন, এগুলো কিছুই নয়, সমুদ্র আর সমুদ্রের জল। কিন্তু সত্যিই এখানে সমুদ্র আছে কিনা কিংবা সমুদ্র থাকলেও তাতে এখন জল আছে কিনা, তা নিয়ে এখন বেশ সন্দেহ জেগে গিয়েছে।

জল আছে কিনা, ওগুলো সমুদ্রই না অন্য কিছু এই সব ঠিক করতে যেয়ে পণ্ডিতেরা অনেক নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছেন, অনেক মজার মজার খবরই পাওয়া

গেছে ; তোমাদেরও সেগুলো শুনতে হয়ত ভালই লাগবে। এই সব বিষয় আলোচনা করতে করতে ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে সিয়াপেরিলি নামক ইটালীর এক বৈজ্ঞানিক মিলান শহরে তাঁর টেলিস্কোপ দিয়ে কাজ করতে করতে যে বিস্ময়কর আবিষ্কার করেন তাতে সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর টেলিস্কোপটি ছিল ছোট, তাই অনেকেই খুঁৎখুঁৎ করলেন। টেলিস্কোপ ছোট হলে কি হয়, ইটালীর সুন্দর আকাশে এই ভদ্রলোক যেমন সুন্দরভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন, পৃথিবীর অন্য কোথাও তেমনভাবে দেখা সম্ভবপর নয়। এ ছাড়া তাঁর আর একটা মস্ত বড় সুবিধেও হয়েছিল। এই সময়ে মঙ্গল গ্রহ ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর খুবই কাছে এসেছিল। তাই এই সময়ে তার ভিতরকার খবর জানাটাও অন্য সময় থেকে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছিল। এই সব কথা ভেবেই সিয়াপেরিলির কথা একেবারে ফেলে দেওয়া গেল না। তিনি অনেক কিছু বর্ণনা করে বললেন যে, এই মঙ্গলে অনেকগুলো খাল আছে। এ খালগুলো খুব ছোটখাট নয় ; এর অনেক-গুলো হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ। এদের সংখ্যাও কম নয়, এরা জালের মত সমস্ত গ্রহটাকে ছেয়ে আছে বললেই চলে। এই টুকুতেই ভদ্রলোক শেষ করলেন না। বৎসর পাঁচেক পরে তিনি জাহির করলেন, "দেখ খালগুলো যে দেখেছিলুম সেগুলো সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ত নেইই, তার সঙ্গে আর একটা

আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করছি। আগে যে খালগুলো দেখেছিলুম সেগুলো ত আছেই, এদের অনেকগুলোর আশপাশ দিয়ে আরও অনেকগুলো নূতন খাল বের হয়েছে মনে হচ্ছে। এই নূতন খালগুলোর কতকগুলো ঠিক সোজা লাইনের মত আগেকারগুলোর সমান্তরাল ভাবে চলে গেছে; অন্যগুলো অবশ্য অত স্পষ্ট সমান্তরাল নয়। কোন কোনটা বা খুব স্পষ্টও নয়, তবুও তাদের অস্তিত্বে সন্দেহ করবার কিছুই নেই।”

কিছুদিন এমনি চলল। অনেকেই এদিকে মনোযোগ দিতে সুরু করলেন। কতদিন পরে এই নূতন খালগুলো আর দেখতে পাওয়া গেল না, তারা যেন ফুস্ মন্তরের মতই গ্রহরাজ্য থেকে একেবারে উবে গিয়েছে। এমনি কতদিন রইল, কিছুদিন পরে আবার তাদের দেখা গেল। এই পুনরাবির্ভাবের সময় মিলিয়ে দেখা গেল যে, বৎসরের কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট সময়েই এই নূতন খালগুলো দেখা যায়। এরা কিছুদিন ঠিক থেকে আবার মিলিয়ে যায়, এই নূতন খালগুলো সাময়িক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এইগুলো কেন যে হয়, কেনই বা এক সময় ছাড়া তাদের আর দেখতে পাওয়া যায় না, কেনই বা তারা আবার মিলিয়ে যায় তার আর কোন মীমাংসাই হয় নি।

তোমরা জান আমাদের পৃথিবীর একেবারে উত্তর আর একেবারে দক্ষিণ সব সময়েই বরফে ঢাকা থাকে। সব সময়েই সাদা—সে যেন সাদারই রাজ্য, সাদা ধব্‌ধব করছে। দূরবীক্ষণ

দিয়ে যদি মঙ্গল গ্রহের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখ, তা'হলে দেখবে এরও উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ সব সময়েই সাদা, ঠিক আমাদের পৃথিবীর মেরুপ্রদেশের মতই। খুব সম্ভব এও বরফের জন্যই। তবে আর একটা জিনিস হ'ল, এই মেরু-প্রদেশের সাদার রাজ্যটা সব সময়ে সমান থাকে না। মঙ্গলের যখন শীতকাল তখন দেখবে এর অনেকটা জায়গা সাদা হয়ে গেছে ; শীত যত বেশী হচ্ছে তত বেশী জায়গা সাদা হচ্ছে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ঠিক বিপরীত। তখন আর অতটা সাদা থাকে না। যতই গরম বেশী হওয়া সুরু করে ততই এই সাদার রাজ্য কমতে থাকে। গ্রীষ্মকালে এই কমতি হওয়ার কারণ বোধ হয় তখন বরফ গলতে সুরু করে। যত বেশী গরম হয় তত বেশী বরফ গলে, সাদার রাজ্যও ততই কমতে থাকে। হয়ত এই খালগুলো দিয়েই বরফগলা জল সমস্ত দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যা হোক, এতে খালের দরকার বা উপকারিতা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু এই নূতন খালগুলো যে কেন হ'ল তা বোঝা যায় না। সত্যি সত্যিই এ একটা মস্ত বড় সমস্যা হয়ে রয়েছে, এখনও এর কোন মীমাংসাই হয় নি। তোমরা যদি সত্যিই মঙ্গলে যেয়ে পৌঁছতে পার তা'হলে এর কারণটা ঠিক ভাবেই জেনে আসতে পারবে আশা করি।

একদল বৈজ্ঞানিক আছেন তাঁরা এ খালগুলোর কথা একটুও বিশ্বাস করতে চান না। তাঁরা বলেন, যেগুলো খাল

বলে মনে হয় আসলে সেগুলো খাল টাল কিছুই নয় ; চোখের ধাঁধা মাত্র। তাঁদের মতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ অবসন্ন হয়ে আসে, তাই ঐ ধোঁয়াটে কতকগুলো লাইনের মত দেখা যায়।' অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে চোখে আবছা আবছা দেখা যায়, সে বোধ হয় তোমরা জান—এই সময় এমন কতকগুলো জিনিস দেখা যায় আসলে যাদের অস্তিত্ব বলতে কিছু নেই। এমনি সাধারণ জিনিসের বেলায় আমাদের এই পৃথিবীর উপরেই যখন এমন ব্যাপার ঘটে, তখন এই দূর দূরান্তের ব্যাপারে অনেক কিছুই দেখা সম্ভব। সুদূর আকাশে যে বিরাজমান, খালি চোখে যাকে দেখতেই পাওয়া যায় না, দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখতে চোখের ত এমনি কত খাটুনী হয়, তা' ছাড়া আলোটাও যে খুব জোরের তাও বলা চলে না, এই দুর্ব্বল আলোর জন্যে চোখের খাটুনী যায় আরও বেড়ে, এই সব কারণেই অমনি কতকগুলো খাল-বিল চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে !

এ ত গেল চোখের খাটুনীর কথা। এ ছাড়া আর একটা জিনিস হ'ল এই যে, এই খালগুলোকে যাঁরা দেখেছেন বলে মনে করেন, তাঁরা সব্বাই একবাক্যে এগুলোকে সরল রেখার মতই বলে নির্দ্দেশ করেছেন, কিন্তু এমনি ভাবে সরল রেখার মত দেখতে পাওয়া সম্ভবপর কিনা সেও একটা ভাববার বিষয়। প্রথম কথা হচ্ছে, যদি ওখানে সরলও থাকে তা'হলেও এখান

থেকে সব সময়েই সেটাকে কিছুতেই সরল দেখা যেতে পারে না। দু' এক সময় যদিও বা সরল দেখা যেতে পারে, তবুও মঙ্গল যখন ঘুরতে ঘুরতে অন্য এক ভাবে উপস্থিত হবে তখন এগুলোকে আর আগের মত কিছুতেই সরল রেখা দেখা যেতে পারে না—বরং বাঁকাই হবে।

এত বিরুদ্ধ সমালোচনা করলে কি হবে—এঁরাও বড় পাত্তা পাচ্ছেন না। ধরলুম প্রথম প্রথম যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা নয় এমনি ভুলই করেছিলেন, কিন্তু এখনও যাঁরা সব জেনেশুনেও এসব দেখেন এবং খাল আছে বলেই বিশ্বাস করছেন, তাঁরা যে তেমনি ভুল করছেন, তাই বা কি করে বলা চলে? সব্বাই চিরকাল একই ভুল করে আসছে, এমন কথা বিশ্বাস করা সুকঠিন। অথচ মঙ্গলগ্রহে এই যে দাগ দেখতে পাওয়া যায়, এগুলো চিরকালই রয়েছে। দু শ' বৎসর আগেও বৈজ্ঞানিকেরা যেমন দেখেছিলেন, আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরাও ঠিক তেমনি দেখছেন। এগুলো নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা ভারী মুস্কিলেই পড়েছেন।

যাক্, ধরা গেল না হয় এগুলো খালই, কিন্তু এই খালগুলো হ'ল কি করে? যেমন সুন্দরভাবে এগুলো সাজান রয়েছে, মানুষ বা মানুষের মত জীব ছাড়া অন্য কেউ যে এমনটা করতে পারবে তা ত মনে হয় না। এমনি যদি খোদা-দত্ত হ'ত, তা'হলে অত সোজা, অমন একটা আর একটার সমান্তরাল হয়ত

হ'ত না। খোদা সবগুলো একভাবে কোনদিনই তৈরী করেন না, অন্ততঃ পৃথিবীতে যে সব নজির পাওয়া যায় তাতে তাই মনে হয়। তা'হলে দেখা যাচ্ছে চাঁদ মামার দেশে মামাদের পাত্তা পাওয়া না গেলেও শেষ পর্য্যন্ত এই মঙ্গলের রাজ্যে তাঁদের কাউকে দেখতে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। দেখা যাক্।

এই খাল-বিলের কথা এখন ছেড়েই দেওয়া যাক্—কি বল? যা নিয়ে এত গোলমাল তাকে নিয়ে আর এখন থেকেই এত মারামারি করে লাভ কি? একবার যেয়ে উপস্থিত হতে পারলে চাক্ষুষ সব পরিচয় করে নেওয়া যাবে। তখন দেখা যাবে কেই বা ঠিক বলছে, আর কেই বা ভুল করছে।

এই খাল-বিলের কথাই শুধু নয়, এখানে আরও কতকগুলো মজার মজার জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। দূরবীক্ষণ দিয়ে চেয়ে দেখলে তোমরাও দেখতে পাবে। এই গ্রহরাজ্যে সব সময়েই যেন একটা রংএর খেলা চলছে। এর বসন্তকাল অর্থাৎ শীত-গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে সাধারণতঃ দক্ষিণ গোলার্দ্ধে ও গ্রীষ্মমণ্ডলে অনেকটা জায়গা কালো কালো দেখা যায়। শুধু এক-আধবারের কথা নয় যে, চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে—বরং প্রত্যেক বৎসরই ঠিক নিয়মিত ভাবে এই কালো কালো জিনিসগুলোর উদ্ভব দেখা যায়। তার পরে এরা রং বদলাতে থাকে। হয়ত এই দেখলে সবুজ, কিছুদিন পরে

দেখলে—না আর সবুজ নয়, তামাটে। আবার কিছুদিন পরে দেখা গেল, সেই তামাটে রংটা আর নেই, বদলে আবার আগেকার মত সবুজ হয়ে গেছে। শুধু এক জায়গার কথা নয়, অনেক জায়গাতেই এমনি দেখতে পাওয়া যায়।

চাঁদ মামার দেশের পাহাড়-পর্ব্বত খাদগুলোর নামকরণ করা হয়েছে সে ত তোমরা জানই—অবশ্য সেটা আমাদের পণ্ডিতদের দেওয়া নাম। সে দেশে, এগুলোর কি নাম দেওয়া হয়েছে কিংবা আদৌ কোন নাম দেওয়া হয়েছে কিনা সে অন্য কথা। এই মঙ্গলের বলায়ও আমাদের পণ্ডিতেরা নামকরণ করতে পিছপাও হন নি। রংএর খেলায় বাহাদুরী নিতে পারে এমনি একটা জায়গার নাম দিয়েছেন, সারটিস মেজর (Sirtis Major)। জায়গাটি পণ্ডিতদের কাছে খুবই পরিচিত। তোমরাও ধৈর্য্য ধরে কিছুদিন এর প্রতি নজর রাখতে পারলে, একে ভাল ভাবেই চিনে নিতে পারবে। এর রংএর খেলার বাহার খুবই আশ্চর্য্যের। একে কিছুদিন দেখা গেল ধূসরবর্ণের, তারপর দেখা গেল রংটা আর ধূসর নেই, বদলে সবুজ হয়ে গেছে। আবার কিছুদিন পরে দেখা গেল—না আর সবুজও নেই, নীল হয়ে গেছে। কিছুদিন পরে আবার নীল রংটাও বদলে হয়ে গেল লালচে। লালচেও বেশীদিন রইল না, সেটা আবার হয়ে গেল বেগুনী।

কালো কালো যে জায়গাগুলো দেখা যায়, পণ্ডিতেরা

আগে এগুলোকেও মনে করতেন সমুদ্র। তাঁরা বলতেন, এদের কালো কালো দেখতে পাওয়ার কারণ হ'ল এদের জল। আমরা সমুদ্রের জলকে সাধারণত দেখতে পাই নীল রংএর। এখানে নীল না দেখে কালো দেখি তার কারণ হ'ল যে, এ রয়েছে অনেক দূরে। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথম প্রথম তাঁরা এই সব ঠিক করে নিয়েই বেশ খুসি মনে দিন কাটাচ্ছিলেন, কিন্তু এই রংএর পট-পরিবর্ত্তনই সব গোলমাল করে দিল।

এর আর কোন হিল্লেই তাঁরা করতে পারলেন না। তাই ত জলপোরা সমুদ্রই যদি হবে, তা'হলে আর এক একবার এক এক রং কেন? তা ছাড়া আর একটা কথাও এসে পড়ল। এগুলো যদি জলই হবে, তা'হলে জলের অন্য গুণগুলোর কি হ'ল? সেগুলো তো আর উবে যেতে পারে না, সেগুলোও দেখা দিতে বাধ্য। তোমাদের হয়ত চাঁদের কথা মনে আছে। চাঁদে জল আছে কিনা তা ঠিক করা গেছিল এক সুন্দর উপায়ে—সূর্য্য প্রতিফলিত হওয়া দেখতে পাওয়া যায় কিনা তাই দেখে। ঠিক সেই পথই এখানেও অবলম্বন করে দেখা গেছে, কিন্তু চাঁদ মামার মত মঙ্গলগ্রহও একেবারে নিরাশ করেছেন। এমন যে বড় বড় সমুদ্রের কল্পনা করা গেছিল, তার কোনটাতেই জলের নাম-নিশানাও নেই। খালগুলোতেও জলের কোন চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। সমুদ্র সমুদ্র বলে যেসব পণ্ডিতেরা হৈ-চৈ

করছিলেন, তাঁরা ত একবারে থ হয়ে গিয়েছেন! তোমরা হয়ত বলবে, তা'হলে মেরুপ্রদেশে সাদা বরফের মত যে সব জিনিস দেখা যায়, সেগুলো কি? যদি জলই না থাকে, তা'হলে আর বরফ হবে কি করে? সত্যিই এ নিয়ে মুস্কিলে পড়া গেছে। কি যে হতে পারে, তা এখন পর্য্যন্ত ঠিক করা যায় নি; হয়ত বা বরফ, নয়ত শুধু তুষার বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বা মাটির উপর জমে রয়েছে। কিংবা অঙ্গার-অম্ল অনেক বেশী পরিমাণে জমা হয়ে রয়েছে, এতদূর থেকে তাই সাদা সাদা দেখাচ্ছে—কি অন্য কোন সাদা জিনিস আমরা যার নাম-নিশানাও জানি না। খোদার দুনিয়ায় কত কিই হতে পারে। তবে ঐ সাদা জিনিস যাই হোক না কেন, একটা কথা ঠিকই যে, এই মঙ্গলের রাজ্যে খাবার জল পাওয়া খুবই মুস্কিল হবে। বরফ কি তুষারই যদি হয়, কিংবা জলের বাষ্পেও যদি সারা মঙ্গলটা ভরা থাকে, তাতেই আর কি সুবিধে হবে বল? তাতে তো আর খাওয়া, গোছল, রাঁধাবাড়া চলতে পারে না, তার জন্যে দরকার আমাদের সাধারণ জল। দেখা যাচ্ছে চাঁদ মামার দেশের মত এখানেও যেতে হলে সাবধান হয়ে যেতে হবে। জল কিছু সঙ্গে নিতেই হবে। দৈবাৎ যদি না পাওয়া যায়—না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী—তখন কিন্তু বেশ মুস্কিলে পড়তে হবে।
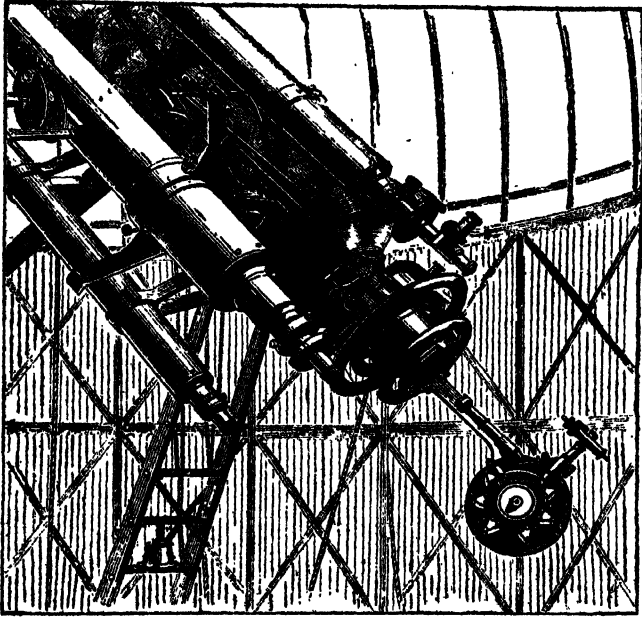
আলো বিশ্লেষণ করবার যন্ত্রসহ একটি টেলিস্কোপ

জলের কথা গেল। এখন বাতাস—বাতাস কেমন আছে? জল আর বাতাস এ দুটো ছাড়া ত পৃথিবীর মানুষ আমরা—আমাদের চলবার উপায় নেই। জলের বেলায়ই যখন এমনি নিরাশ হতে হ'ল, তখন বাতাসের বেলায় আবার কি হয়েছে কে জানে? মঙ্গলের দিকে রওয়ানা হওয়ার আগেই সেটাও ঠিক করে নিতে হয় এখান থেকেই —কি বল? নইলে অসোয়াস্তি থেকে যাবে। ঠিক অনেকটা হয়েই গেছে তবুও একটু যে সন্দেহ নেই তা নয়। সব কথা ভাল ভাবে জানা যায় নি বলেই আর কি! এত ঘরের কথা নয়, তা ছাড়া নানা মুনির নানা মত; তাতে আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

চাঁদের বেলায় যেমন করে সব বের করে নেওয়া গেছিল, এখানেও তাই করা গেছে। চাঁদের মতই এখানকার আলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে। অবশ্য এখানে বিশ্লেষণে বেশ একটু সুবিধে হয়েছে বলতে হবে। এখানকার উপরকার বাতাস অনেকটা স্বচ্ছ, কোন বাধা-বিঘ্নই এর মধ্যে বড় একটা আসে না। এই পরীক্ষার কাজে সময় সময় পৃথিবীর মেঘে একটু বাধা দেওয়া ছাড়া মঙ্গলের মেঘে বাধা-বিঘ্ন খুব কমই জন্মায়, হয়ত এখানে মেঘ খুব বেশী নেইও। তোমাদের চাঁদের বেলায়ই বলেছি, এই আলো বিশ্লেষণ করে অনেক কিছু ধরা যায়। এখানে যে জিনিসগুলো

আছে, এ আলোতে তাদের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। ছবি তুলে নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা এর মধ্যে কোন্ কোন্ রংএর আলো আছে, তাতে কোন্ কোন্ জিনিস আছে তা ঠিক করে নেন। মঙ্গলের বেলায়ও এমনি পরীক্ষা হয়ে গেছে। এই পরীক্ষাতে বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পেরেছেন যে, মঙ্গলে বাতাস আছে, তবে খুব বেশী নয়। কিন্তু বাতাস থাকলে কি হবে, বাতাসের মধ্যেকার আসল যা জিনিস, যা আমাদের সব চেয়ে বেশী দরকার সেই অক্সিজেন এতে বেশী আছে বলে মনে হয় না। অক্সিজেন বেশী না থাকলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াচ্ছে ভেবে দেখ।

তোমরা হয়ত জান, অক্সিজেনই আমরা নিঃশ্বাসের সাথে নিয়ে থাকি। এ ছাড়া আমাদের বাঁচবার উপায় নেই, কিন্তু অক্সিজেন নিলে কি হবে, যখন প্রশ্বাস হিসাবে সেই বাতাসটাই আমরা বের করে দেই, তখন আর সে অক্সিজেন থাকে না, তার রূপগুণ সবই বদলে যায়, তখন সে দেখা দেয় কার্ব্বন-ডায়অক্সাইড বা অঙ্গার-অম্ল রূপে। তোমাদের হয়ত মনে হতে পারে তাতে আর কি হ'ল—এক ভাবে পাওয়া ত গেল! পাওয়া গেল তা সত্যিই, কিন্তু পাওয়া গেলেই ত হয় না, সেটা আমাদের কোন কাজে লাগে কিনা তাই দেখতে হবে। এই অঙ্গার-অম্লটা আমাদের কোন কাজেই লাগে না। অক্সিজেন প্রাণ বাঁচায়, আর এ একেবারে উল্টো।

আসলে এটা বিষ বললেই হয়। বুঝতেই পারছ, কেমন ভাবে ফিরে পাওয়া যাচ্ছে। যদি অক্সিজেন না থেকে অঙ্গার-অম্ল থাকত, তা'হলে আর দেখতে হ'ত না, আপনিই দম বন্ধ হয়ে কোন দিন মারা যেতে হ'ত! তোমরা হয়ত দেখে থাকবে কি শুনে থাকবে যে, একটা লোক অনেকদিনকার অব্যবহৃত কূপ কি ইঁদারায় নেমে গেল, কিন্তু আর ফিরে আসতে পারল না। পরে দেখা গেল লোকটা মরে গেছে। তার মরার কারণ সম্বন্ধে কত গল্প তোমরা শুনতে পাও। কেউ হয়ত বলছে ভূত ছিল ওর মধ্যে, ভূতে মেরে ফেলেছে; কেউ বা হয়ত বলছে যে, ওখানে জিন ছিল, তাদের বাসার মধ্যে নেমে উৎপাত করার জন্যে তারা রেগে মেরে ফেলেছে ইত্যাদি। কিন্তু সত্যি কি হয় জান? এই সব অব্যবহৃত কূপ বা ইঁদারায় অক্সিজেন মোটেই থাকে না, নানা কারণে কার্ব্বন-ডায়অক্সাইডে পরিণত হয়ে যায়। কেউ এই কার্ব্বন-ডায়অক্সাইডের মধ্যে নেমে গেলে দম বন্ধ হয়েই মারা যাবে এবং হয়ও তাই।

এখন একটা কথা ভেবে দেখ। আমরা সব সময়েই অক্সিজেন ব্যবহার করে কার্ব্বন-ডায়অক্সাইড ছেড়ে দিচ্ছি। এখন যদি প্রত্যেক দিনই আবার নূতন করে অক্সিজেন না আসে তা'হলে কি হবে? যে অক্সিজেন আছে তাই আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যাবে আর তার জায়গায় কার্ব্বন-

ডায়অক্সাইড এসে সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। এমনি ভাবে দু'চার শ বছর চলতে থাকলে ব্যাপারটা কি ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে বুঝতেই পারছ। তখন আর কাউকে বেঁচে থাকতে হবে না। কথাটা ভাবলেই মন আঁৎকে ওঠে। হয়ত বা কোন দিন ধড়ফড় করে মানবলীলা সম্বরণ করতে হয়। খোদাকে ধন্যবাদ সত্যিই তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি আমাদের পৃথিবীতে মস্ত বড় একটা উপায় করে দিয়েছেন, যাতে অক্সিজেন কিছুতেই ফুরিয়ে যেতে না পারে। উপায়টা বিশেষ কিছু নয়, সে হ'ল এই গাছপালা।

আমরা যেমন অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারি না গাছপালাগুলো তেমনি কার্ব্বন-ডায়অক্সাইড ছাড়া বাঁচতে পারে না। আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে যে কার্ব্বন-ডায়অক্সাইড ছেড়ে দেই, গাছপালাগুলো সেইগুলোকে নিয়ে নেয় নিজেদের পরিপোষণের জন্য। শুধু নিয়ে নেওয়াই নয়, একে ভেঙ্গেচূরে সে আবার এ থেকে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। কেমন সুবিধে দেখতেই পারছ। আমরা অক্সিজেন ব্যবহার করে এক ভাবে ছেড়ে দিলুম, অনেক হাতফেরতা হয়ে আবার সেটা ফিরে এল আমাদের কাছে ঠিক আগের মতই। তা'হলে এর আর ফুরানোর কথাই উঠতে পারে না। যদি গাছপালা না থাকত, তা'হলে আর এমনটি হতে পারত না; অক্সিজেনের ভাণ্ডারটা আস্তে আস্তে ফুরিয়ে

আসত। আজকাল দেশে দেশে যুদ্ধবিগ্রহ চলছে মাটির জন্যে—কে কোথায় কতটা জমি দখল করে নিতে পারে তারই জন্যে, তখন মারামারি চলত এই অক্সিজেন নিয়ে। বেঁচে থাকার জন্যে যেমন খাবার চাই, তার চেয়ে বেশী চাই আক্সিজেন। খাবার না হলে দু-চার দিন বাঁচা যেতে পারে, কিন্তু অক্সিজেন না হলে পাঁচ মিনিটও বাঁচা যাবে না। বুঝতেই পারছ, তা'হলে এই অক্সিজেনের জন্য কেমন মারামারি চলত!

মঙ্গলগ্রহের আলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে অক্সিজেনের ভাগ খুব কম। আমাদের পৃথিবীতে যে পরিমাণ আছে, তার একশ' ভাগের পনের ভাগ হয়ত এখানে থাকতে পারে। তা ছাড়া যাও বা আছে তাও যেন আস্তে আস্তে কমেই আসছে। মঙ্গলে যদি আমাদের মতই কোন জীব থেকে থাকে, তা'হলে তাদের কি অবস্থা হয়েছে বুঝতেই পারছ। তারাও যদি আমাদের মত মারামারি কাটাকাটি যুদ্ধবিগ্রহে অভ্যস্ত হয়, তা'হলে যে তাদের মধ্যে এতদিনে বেশ বড় রকমের একটা যুদ্ধ চলছে সে ঠিকই। কিন্তু সে যুদ্ধটা টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, জমি-জেরাত তা কাঁচা মালের জন্য নয়, সে হচ্ছে নিছক অক্সিজেন নিয়ে, অর্থাৎ এমন একটা জিনিসের জন্যে, যাকে আমরা এখন ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না। অনেক বেশী পরিমাণে পাচ্ছি কিনা, কে

আর ওর জন্যে কেয়ার করে! মঙ্গলবাসীদের তো আর তা নয়। তারা এখন সোনা-রূপা নিয়ে আর কি করবে? সোনা-রূপা নিয়ে ত আর বেঁচে থাকা যায় না, বেঁচে থাকার জন্যে চাই অক্সিজেন—নিছক অক্সিজেন। তাই সেই দিকেই তারা মনোযোগ দিচ্ছে, হয়ত বা সেই জন্যে বেশ মারামারিও লাগিয়ে দিয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, জলের মত বাতাসেরও এখানে প্রাচুর্য্য খুব বেশী নয়। তবে জল যেখানে নেই বলতে কিছুই নেই, বাতাসের বেলায় অতটা না হলেও, তারও দুর্ভিক্ষ যে পড়ে গেছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমাদের সেখানে যেতে হলে আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে যেতে হবে। তোমাদের হয়ত মনে হচ্ছে, আবার কেন এই সব বোঝা! একটু একটু যখন রয়েছে, তখন আর আমাদের অত কষ্ট করে বয়ে নিয়ে না গেলেও চলে! সেখানকার লোকগুলো কি আর এতটুকু আতিথেয়তা দেখাবে না, এই বিদেশ থেকে যখন যাচ্ছি? তোমাদের কথা হয়ত খানিকটা ঠিক হতেও পারে, কিন্তু তারা কেমন অতিথিপরায়ণ সে বিষয়ে ত আমাদের কিছু মাত্র জ্ঞান নেই। তা ছাড়া তারাও এমনিতেই রয়েছে অভাবের মধ্যে, সেখানে আমরা যেয়ে যদি আবার ঘাড়ে চেপে বসি, তা'হলে তারা বেশ টানাটানিতে পড়ে যাবে। খুব বেশী অতিথিপরায়ণ হলেও যে আমাদের বিশেষ কিছু সাহায্য

করতে পারবে তা ত মনে হয় না। অতএব আমাদের নিজেদেরই সব বন্দোবস্ত করে যাওয়া ভাল। কথায় বলে, সাবধানের মার নেই, কি বল?

তোমাদের হয়ত ভাবনা হচ্ছে, আবার সেই জবরজঙ্গ প্রথা, কতকগুলো. বাক্স-পেঁটরা পোঁটলাপুঁটলি, অক্সিজেন-সিলিণ্ডার ইত্যাদি ইত্যাদি। এক একজনের সঙ্গে এক একটা মোট কুলীর মত বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে—তা ছাড়া চাঁদের মত অত হাল্‌কাই কি পাওয়া যাবে সব! কিন্তু খুব বেশী ভয়ের কিছু নেই। চাঁদ মামার দেশের মত অতটা হাল্‌কা না হলেও হাল্‌কা যে কতকটা হবেই, সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তোমাদের আগেই বলেছি, একে আমাদের পৃথিবীর ছোটভাই বলা যেতে পারে—শুধু ঘোরাঘুরি ব্যাপারেই নয়, প্রায় সব ব্যাপারেই। এই ধর না এর ব্যাসের কথা—এর ব্যাসটা হ'ল আমাদের পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্দ্ধেক, ৪২০০ মাইল—অর্দ্ধেকের চেয়ে একটু বেশী আর কি! এর নিজের ভিতরকার শক্তিও অনেক কম, ওজনে বোধ হয় পৃথিবীর দশভাগের একভাগও হবে কিনা সন্দেহ। তোমাদের চাঁদের বেলায় বলেছি, যে জিনিসের ওজন যত বেশী, সে তত বেশী জোরে অন্য জিনিসকে নিজের কাছে টানতে পারে। সেটা তোমরা এমনিও দেখতে পার। তোমাদের ক্লাসের মধ্যে সব চেয়ে বেশী বলবান যে, সে হিড়হিড় করে কেমন

অন্যকে টেনে নিয়ে যায়; কিন্তু যে দুর্ব্বল, সে কি আর তেমন পারে? তাকেই ত আর একজন টেনে নিয়ে যাবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এমনি টানাটানির ব্যাপার চলছে—শুধু পৃথিবী কেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভরেই এই ব্যাপার। আর এই টানটার পরিমাণই হ'ল জিনিসের ওজন। মঙ্গল আর তার এই দুর্ব্বল দেহ নিয়ে কত জোরে টানবে! তার দেহটাও ছোট, শক্তিও কম; তাই সেখানে যাওয়ার পর সমস্ত জিনিসের ওজনও যাবে কমে। এখানে যে জিনিসের ওজন তিন মণ, সেটাকে আর তিন মণের মত লাগবে না—মনে হবে যেন খুব বেশী হলেও এক মণ। দেখা যাচ্ছে, লটবহর নিয়ে একটু অসুবিধা হলেও খুব বেশী বাধবে না।

চাঁদের দেশের মত এখানেও এথলেটদের হবে সব চেয়ে বেশী সুবিধা। অবশ্য সেখানকার মত রেকর্ড কেউই করতে পারবে না, তবুও পৃথিবীর রেকর্ড ত ভাঙ্গতে পারবে। পৃথিবীতে যে লংজাম্পে ২৪ ফিট যেতে পারে, এখানে সে যাবে ৭২ ফিট! হাইজাম্পে যে ওঠে ১০ ফিট সে এখানে অনায়াসে ৩০ ফিট উঠতে পারবে! আমাদের হাওয়াই জাহাজকে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে আসতে সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে যাত্রা সুরু করতে হয়েছিল। কিন্তু এখান থেকে যদি কেউ শূন্য রাজ্যে যেতে চায়, তা'হলে তাকে আর অত বেগে যেতে হবে না; সেকেণ্ডে তিন মাইল বেগে সুরু করতে পারলেই হয়—তা'হলেই একদম

অনন্ত রাজ্যে যেয়ে উপস্থিত। সূর্য্য থেকে দূরে আছে বলেই কিন্তু এ দেশটা অনেক অসুবিধা থেকে বেঁচে গেছে। এর যেমন ছোট দেহ, অন্যের তুলনায় বলহীন বললেও চলে, একে যে কি নাস্তানাবুদই না হতে হ'ত সূর্য্যের কাছাকাছি থাকলে, সে আর বলবার নয়। এই যে বাতাস ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তখন আর এদের চিহ্নও দেখতে পাওয়া যেত না। সমস্তগুলো উড়ে কোথায় যে চলে যেত, তার আর কোন ঠিকানাই আজ দেওয়া যেত না।

জলবায়ুর সংবাদ পাওয়া গেছে। দিন-রাতের খবর ত আগেই পেয়েছি। আর একটা জিনিস হলেই আমরা যাত্রা সুরু করতে পারি। চাঁদের বেলায় অনেক পাহাড়, পর্ব্বত ও খাদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই মঙ্গলের রাজ্য যদিও সব দিক দিয়ে চাঁদের দেশের মত নয়, তবুও কতকটা ত মিল আছে; তা ছাড়া আমাদের পৃথিবীর সঙ্গেও যখন এতটা সামঞ্জস্য রয়েছে, তখন এখানেও পাহাড়-পর্ব্বত দেখতে পাওয়া যাবে কি? সত্যি কথা বলতে কি, এ নিয়ে পণ্ডিতেরা খুবই মুস্কিলে পড়েছেন। তোমাদের আগেই বলেছি, এখানে অনেকটা জায়গা কালো কালো দেখা যায়, আর খালের মতও অনেক কিছু দেখা যায়। আগে এই কালো জায়গাগুলোকে অনেকে সমুদ্র বলে মনে করতেন, আর তার আশে পাশে যে সাদা জায়গা দেখা যায়, সেগুলোকে

বলতেন মাটির দেশ, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল—না ওগুলো সমুদ্র নয়। তা'হলে ওগুলো কি?

কেউ কেউ বলেছেন, ঐ যে কালো কালো জায়গা দেখা যায়, ওগুলো সমুদ্রও নয় পাহাড়-পর্ব্বতও নয়, ওগুলো মানুষের বসতি! লোকের বসতি, ঘন গাছপালা বা তেমন জাতীয় কিছুর জন্যেই ওগুলোকে কালো কালো দেখায়। আর যেগুলো খালের মত দেখায়, সেগুলো সত্যিই খাল নয়। সেইগুলোই হ'ল পাহাড়, পর্ব্বত ইত্যাদি; আর পাহাড়ের পাশ দিয়ে রয়েছে যে সাদা সাদা দেশ, সেটা মাটি নয় বরং সেই হ'ল সমুদ্র। তাঁদের যুক্তির মধ্যে মস্ত বড় একটা কথা হ'ল এই যে, ঐ যে কালো কালো জায়গাগুলো দেখা যায়, সেগুলো সব জায়গাতেই সমান কালো নয়, কোথাও বেশী—কোথাও কম, এক রকমের কোথাও নয়। আর সেটা মানুষের মত জীবের বসতির জন্যেই সম্ভবপর হতে পারে। যেখানে বসতি ঘন, গাছপালা বেশী এবং সতেজ, সেখানে কালোটা একটু বেশী, আর যেখানে বসতি কম, মাটিও তেমন উর্ব্বর নয়, গাছপালাও কম এবং নিস্তেজ, সেখানকার রংটা আর অত কালো দেখা যাবে না। তা ছাড়া এতে রং বদলানোর ব্যাপারটাও অনেকটা বুঝা যেতে পারে। ঋতু অনুযায়ী গাছপালার পরিবর্ত্তন সে ত আমরা এখানেই দেখতে পাই। শীতের সময় সব গাছের পাতা ঝরে যায়, তাদের মূর্ত্তি হয়ে পড়ে নীরস নিস্তেজ, আগেকার

রিফ্লেক্টর-টেলিস্কোপ
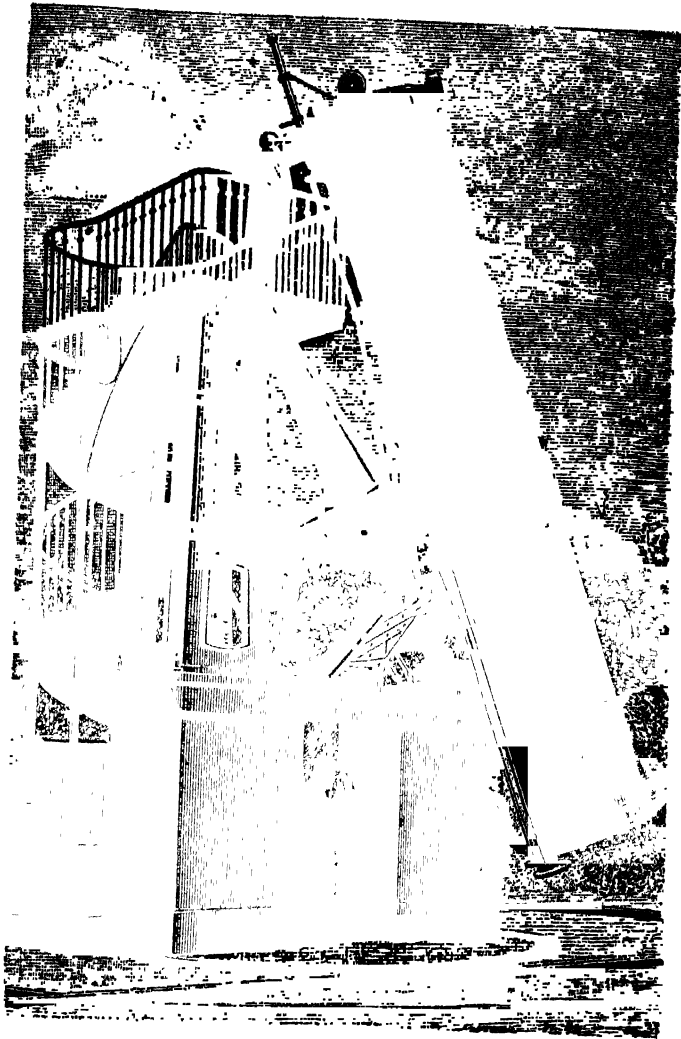
শ্যামলতা বলে কিছুই থাকে না; আবার বসন্ত কালে নূতন পাতা নূতন ফুল হয়, তখন আবার অন্য রকম রং। এমনি করেই ত চলছে এই মঙ্গলগ্রহেও। সেটা একেবারে অসম্ভবও নয়। অনেকেই এই গাছপালা ও লোকের বসতির কথা মেনে নিয়েছেন, কেউ কেউ আবার খালগুলোকে সত্যিই খাল বলে স্বীকার করেন, কিন্তু সমুদ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবারই প্রায় একমত: না—সেটা সম্ভবপর নয়, তা'হলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যেতই যেত।

তোমরা হয়ত ভাবছ দূরবীক্ষণে এত কিছুই দেখা যায়—জীবজন্তু, গাছপালা যদিই বা থাকত, তা'হলে এমন কালো কালো না দেখিয়ে কি স্পষ্টই দেখা যেত না? সে সম্ভবপর নয়—অন্ততঃ আমাদের এখন যে দূরবীক্ষণ আছে তাই দিয়ে। যদি এর পরে আরও বড় দূরবীক্ষণ তৈরী হয়, তা'হলে হয়ত এগুলো স্পষ্ট-ভাবেই দেখা যাবে। যাক্ এখন আমাদের অনুমানের উপর নির্ভর করেই থাকতে হবে—অন্ততঃ যতক্ষণ না নিজেরা ওখানে যেয়ে ওখানকার সব খোঁজ-খবর নিতে পারি। মঙ্গলগ্রহে কি আমরা সত্যিই মানুষের সাক্ষাৎ পাব? এই প্রশ্ন নিয়ে আজকাল পণ্ডিতেরা অনেকেই মাথা ঘামাচ্ছেন। অধিকাংশের মত হ'ল—হ্যাঁ, দেখতে পাওয়া যাবে। আর লোকগুলো শুধু আমাদের মতই নয়—আমাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান, অনেক কৌশলী এবং অনেক উন্নত। এই যে খালগুলো দেখা যায়,

এগুলো তাদেরই তৈরী, চাষবাসের সুবিধের জন্যে। সমস্ত মঙ্গল রাজ্যে এই খালগুলো ছেয়ে রয়েছে। এতেই বোঝা যায় তারা দেশের উন্নতির জন্যে কত কাজই না করছে। তাদের সভ্যতার বা উন্নতির সঙ্গে আমাদের সভ্যতার বা উন্নতির তুলনাই চলতে পারে না। তবে আমরা যদি এমনিভাবে কিছুদিন চালিয়ে যেতে পারি, তা'হলে যে তাদের সমান হ'ব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আমরা যেমন আজকাল কোল-ভীল সাঁওতাল-নিগ্রো প্রভৃতিদের অসভ্য বলে ঘৃণা করি, মঙ্গল-গ্রহের লোকগুলোও আমাদের তেমনি অনুন্নত, অসভ্য বলে ধরে নিয়েছে তাদের গ্রহ থেকেই দেখেশুনে।

মঙ্গলের লোকগুলো দেখতে শুনতে কেমন, সে বিষয়ও জল্পনা-কল্পনায় ঠিক হয়ে গেছে। বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ খুব কম বলে বেঁচে থাকার জন্যে এখানকার লোকগুলোকে একসঙ্গে অনেকটা বাতাস একই নিঃশ্বাসে নিতে হয়। তাই তাদের ফুস্‌ফুস্‌টা এবং বুকও নিশ্চয় বড় হবে। ফুস্‌ফুস্‌ আর বুকের অনুপাতে শরীর হলে এখানকার লোকগুলো যে খুব উচু ও চওড়া হবে, সে নিঃসন্দেহ। সব কথা বিবেচনা করে দেখলে অনায়াসে বিশ্বাস করা চলে যে, তারা আমাদের চেয়ে অনেক লম্বা চওড়া—ঠাকুরমার গল্পের এক একটা দৈত্যের মতই আর কি! কে জানে হয়ত ঠাকুরমার ঠাকুরমার ঠাকুরমা—কি তারও কোন অতি পূর্ব্বপুরুষ মঙ্গলের কোন

লোককে দেখেই দৈত্যের গল্প ছড়িয়ে গেছেন। যাক্, এ তো গেল অতি বড় বড় কথা, অনেকটা সেই রাম না জন্মাতেই রামায়ণের মত আর কি! সত্যিই যে ওখানে মানুষের মত জীব বাস করে, তা ভাববার কারণগুলো কি তাই তোমাদের বলছি।

প্রথমতঃ ধরা যাক্ তাপের কথা। খুব বেশী গরম হলেও যেমন জীবজন্তুর বাস অসম্ভব, খুব ঠাণ্ডা হলেও তেমনি জীবজন্তু বাঁচতে পারে না। সাধারণতঃ ৮০° ডিগ্রী মত তাপ হলেই জীবজন্তুর বাঁচা সম্ভবপর। এ হ'ল গড়পড়তা সাধারণ হিসেবে। এর চেয়ে কম তাপ থাকলেও যে লোকের জীবনধারণ একেবারে অসম্ভব নয়, তার নজির ত আমাদের পৃথিবীতেই পাওয়া যায়। গ্রীণল্যাণ্ডে যারা বাস করে, তাদের এর চেয়ে অনেক কম তাপ নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। মঙ্গলগ্রহের সাধারণ তাপটাও অনেকটা এর কাছাকাছি—৬০।৭০° ডিগ্রী হবে বলেই অনেকে মনে করেন। এ তাপে মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়—তবে হ্যাঁ, রাত্রিবেলায় এর তাপ অনেকটা কম হয়ে পড়ে, সাধারণতঃ শীতপ্রধান দেশে যেমন হয়ে থাকে। মোট কথা একে আমাদের শীতপ্রধান দেশের মত একটা দেশ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এ তো গেল তাপের কথা—এর পরে দরকার বাতাস আর জল। জল হয়ত এমনিতে নেই, তবে বরফ বা তুষার

ইত্যাদির মত হয়ে আছে ; তাতে কিছু অসুবিধা হলেও কাজ চলতে পারে। শুধু বরফ বা তুষারই নয়, জলের বাষ্পও আছে বলে অনেকে মনে করেন। ডাক্তার স্লিফারের মতে এখানে বাষ্প না থেকেই পারে না। অনেকের মতে আমাদের পৃথিবীতে যতটা জলীয় বাষ্প আছে, তার একশ' ভাগের পাঁচ-ভাগের মতন অংশ মঙ্গলেও আছে। বাতাসের কথাও তাই, যা আছে আপাততঃ তাতেই চলে যাচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে বেঁচে থাকবার জন্যে যেগুলোর সব চেয়ে বেশী দরকার, সেগুলো কম পরিমাণে থাকলেও আছে ; তাই মানুষের বাস এখানে অসম্ভব নয়। তবে একটা কথা ঠিকই, এখন ওখানে মানুষ থাকলেও আর বেশী দিন থাকতে হবে না। যে রকম ভাবে অক্সিজেন কমে আসছে, তাতে কিছুদিন পরে যে অক্সিজেনের অভাবেই তাদের জীবনলীলা শেষ হয়ে আসবে, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। অবশ্য কিছু পরে বলে মনে করো না যেন যে, কাল-পরশুই আমরা সংবাদ পাব ওখানকার লোকগুলো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে গেছে। এ 'কিছুদিন' শূন্য রাজ্যের হিসাবেই ধরতে হবে—দু-একদিন বা দু-এক বৎসর বা দু-চার হাজার বৎসরও নয়, এমন অবস্থা হয়ত লাখ লাখ বৎসর পরে হবে—তখন মঙ্গলের রাজ্য চাঁদ মামার দেশের মতই হবে লোকজনশূন্য মরুভূমি !

মঙ্গলের আজকাল যা অবস্থা তাতে মনে হয়, এ যেন ঠাকুরমার ঝোলার সেই রাজকন্যার দেশ, যার লোক-লস্কর হাতী-ঘোড়া সব খেয়ে ফেলেছে রাক্ষসে। এখন সে একাই বেঁচে আছে অতি ভয়ে ভয়ে। জীয়ন-কাঠি মরণ-কাঠি দিয়ে রাক্ষসেরা তাকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছে। হয়ত মঙ্গল-গ্রহের অধিবাসীদের সব বিষয়ে এমনি ছুরবস্থা দেখে তোমরা এখন মনে মনে সহানুভূতি জানাচ্ছ, হয়ত বা মনে মনে একটু হাসছই—এই ত অবস্থা, তার আবার সভ্যতার গৌরব নিয়ে বড়াই! ছুদিন পরে যাদের খোঁজ-খবরই পাওয়া যাবে না, তাদের আবার এত অহঙ্কার! যতই হাস না কেন, পণ্ডিতদের একটা কথা মনে রেখো, তোমাদেরও এমন দিন কখ্খনও থাকবে না। এখনও জল আর বাতাসের কোন অভাবই নেই। পৃথিবীর তিনভাগ জুড়ে রয়েছে জল আর তার মধ্যে কোন রকমে একভাগ মাটি ভেসে রয়েছে—তার উপর সময় সময় বৃষ্টির এমনি উৎপাত আরম্ভ হয় যে, ছু-চারদিন ঘর থেকেই বের হওয়া দায় হয়ে উঠে। বাতাসের বেলায়ও তেমনি; সময়ে সময়ে এমনি ভাবে এসে দেখা দেয় যে, ঘর-বাড়ী সব ওলটপালট করে রেখে একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তোলে। আর তাপ—তোমরা হয়ত ভাবছ, তাপের কথা আর বলতে হবে না। আমাদের এই গরমের দেশে তাপের প্রকোপ আর কে না জানে? কিন্তু পণ্ডিতেরা কি বলেন জান? তাঁরা

বলেন—এখন যাই হোক, এরা যত বেশী পরিমাণেই থাকুক না কেন, কোটি কোটি বৎসর পরে এদের অনেকেরই আর দেখা মিলবে না। তোমাদের হয়ত মনে হচ্ছে—বাঃ, কেমন করে তা জানা গেল? অমনি একটা আজগুবী কথা বললেই হ'ল আর কি! পণ্ডিত বলেই যে তাঁর সব আজগুবী কথাকে বিশ্বাস করতে হবে তার কোন মানে আছে কি? আচ্ছা বেশ, এমনি বিশ্বাস না হয়, নিজেরাই ভেবে দেখ না কেন। পৃথিবীর সৃষ্টির কথাগুলো ভাবলেই এ বিষয় বেশ বুঝতে পারবে। পৃথিবী এমনি অবস্থায় এসেছে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে। ঠাণ্ডা হওয়া এখনও শেষ হয় নি, এখনও সে ঠাণ্ডা হচ্ছেই—শেষকালে ঠাণ্ডা হতে হতে এমন অবস্থায় এসে যাবে যে, তখন আর এর নিজের তাপ বলতে কিছুই থাকবে না। তা ছাড়া সূর্য্যের দিক থেকেও সেই এক কথা দেখা যাচ্ছে। সূর্য্য আগে এর চেয়ে আরও তেজোময় এবং আলোময় ছিল; এখন আর তার তত তাপ নেই—হয়ত বা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে এর তাপও কমে আসবে। এখন সূর্য্য থেকে পৃথিবীতে যতটা তাপ আসছে আর ততটা আসবে না। তা'হলে ব্যাপার কি দাঁড়াবে একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। নিজেরও কিছু নেই আর সূর্য্য থেকেও বিশেষ কিছু পাচ্ছে না—ফলে আমরা এখন যাকে গরম দেশ বলি তখন আর তাতে গরমের লেশমাত্রও থাকবে না। এখন যাকে জল দেখছ তাকে আর জল হিসেবেই পাবে

না, রূপান্তর হয়ে সে হয়ে যাবে বরফ। গাছপালাগুলোরও বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে, ফলে অক্সিজেনের ভাণ্ডারও হয়ে আসবে কম। তারপর? তারপর আমাদের এই সোনা-রূপার কথা ভুলে গিয়ে অক্সিজেন নিয়ে মারামারি করতে হবে। আজ যে জার্ম্মান 'জমি জমি' বলে চীৎকার করছে, তখন আর সে জমি চাইবে না, বলবে 'অক্সিজেন চাই।' মঙ্গলগ্রহের লোকগুলো এখন যেমন ভয়ে ভয়ে চলছে, কখন অক্সিজেনটুকু ফুরিয়ে যাবে আর তাদের জীবনলীলারও শেষ, আমাদের পৃথিবীর মানুষেরও তখন তেমনি ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে। আসলে মঙ্গলগ্রহ আমাদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎরূপ।

যাক্ এই সুন্দর দেশের অনেক কিছুই জানা হয়ে গেল। এখন একবার খোদার নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হয়। যতদূর দেখা যাচ্ছে একেবারেই যে অকূলে পড়তে হবে তা নয়, তবে অসুবিধে একটু হবেই। সে আর এমন কি, নূতন দেশে একটু অসুবিধে হওয়া আর এমন কি! তবে যাওয়ার আগে আর একটু সাবধান হয়ে যেতে হবে, যেন পথে আর কারুর ফাঁদে না পড়তে হয়।

মঙ্গল ত পৃথিবীর মতই। পৃথিবীর পাশে যেমন চাঁদ ঘুরছে, তেমনি মঙ্গলের পাশেও ত কেউ ঘুরতে পারে। দু'জনেই যখন একই সূর্য্য থেকে বেরিয়ে এসেছে ঠিক একই ভাবে, তা ছাড়া দু'জনে যখন একই রকম সব দিক দিয়েই, তখন

এদিকেই বা বাদ যাবে কেন? কথাটা হয়ত তোমাদেরও মনে উঠেছে—তাই ত, সত্যিই কি কেউ আছে নাকি? খালি চোখে কিন্তু তোমরা কাউকে দেখতে পাবে না। একটা তারার মত যে ছোট—যার নিজের অস্তিত্বই চোখে পড়ে না, তার আশে পাশে কে ঘুরছে না ঘুরছে তা কি আর চোখে পড়ে? তোমরা হয়ত শুনে আশ্চর্য্য হবে, ইনি নিজে এত ছোট হলে কি হবে, এই পারিষদের সংখ্যায় ইনি পৃথিবীকে টেক্কা দিয়েছেন! পৃথিবীর মাত্র একজন পারিষদ—চাঁদমামা, কিন্তু এঁর দুইজন। ঠিক যেন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ক্ষুদে জমিদার। জমিদারী যতই ছোট হোক না কেন, পাইক-পেয়াদার বহরে আর জঁাকজমকে রাজা-রাজড়াকেও হার মানিয়ে দেয়।

তোমাদের হয়ত মনে হতে পারে, দূরবীক্ষণে বোধ হয় খুব সহজেই এই পারিষদদের পরিচয় পাওয়া যাবে, কিন্তু মোটেই তা নয়। এদের খোঁজ-খবর পাওয়া খুবই মুস্কিল। অনেক বৎসর ধরেই বৈজ্ঞানিকেরা মঙ্গলের উপগ্রহ কেউ আছে কিনা তা জানবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ১৮৭৭ সাল পর্য্যন্ত তাঁরা এদের অস্তিত্বের এতটুকু পরিচয়ও পান নি। দুই-একজন ছাড়া সবাই প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন—না এর কোন উপগ্রহ নেই। যাঁরা একেবারেই আশা ছেড়ে দেন নি, তাঁরা বললেন—তা কেমন করে হবে, পৃথিবীর একটা উপগ্রহ, বৃহস্পতির চার চারটে (তখন পর্য্যন্ত চারটির কথাই জানা

ছিল, এখন আটটার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে), আর এই তুয়ের মাঝখানে থেকেও মঙ্গলের একটাও থাকবে না, এটা কেমন দেখায় ? অন্যপক্ষ বললেন—আহা, তোমার কেমন দেখায় না দেখায় তাই নিয়ে ত আর তুনিয়া চলে না। এ পাশে ও পাশে তুই জনের আছে বলেই যে মধ্যের জনেরও থাকতেই হবে এমন অঙ্কের নিয়ম ত আর সব জায়গায় খাটবে না। আর তা ছাড়া দেখছ ত, পৃথিবী আর বৃহস্পতি তুইজনের মধ্যে থাকলে কি হবে, ইনি কত ছোট! অঙ্কের নিয়ম অনুসারে এর ত পৃথিবীর চেয়ে বড় হওয়াই উচিত ছিল।...

এমনি করেই কথাটা চাপা পড়ে রইল, তবে যাঁরা খুঁৎখুঁৎ করছিলেন তাঁরা একেবারেই হাল ছাড়লেন না।

গল্প-উপন্যাসের কথা কেউ বিশ্বাস করে না, তবে একটু আমোদ দেয় এই মাত্র। বৈজ্ঞানিকেরা ত এসব একেবারে তুচোখে দেখতে পারেন না। কি সব গাঁজাখুরী! যাদের সত্যিকার কোন অস্তিত্বই নেই, সে-সব নিয়ে বাগাড়ম্বর, যা কোন দিন হবে না তাই নিয়ে একটা অর্থহীন প্রলাপ! কিন্তু তবুও এই অর্থহীন প্রলাপের মধ্যেও হঠাৎ তু-এক জায়গায় বৈজ্ঞানিক সত্যও বেরিয়ে পড়ে। তোমরা হয়ত গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়েছ। তার মধ্যে লিলিপুট দ্বীপের কথা তোমাদের মনে থাকতে পারে। গল্পটা পড়লে দেখতে পাবে, লিলিপুটদের দ্বীপে যাওয়ার পথে সমুদ্রের

মধ্যে গালিভারের সহযাত্রী বৈজ্ঞানিকেরা মঙ্গলের দুটো উপগ্রহ আবিষ্কার করে ফেললেন। একটা এর চতুর্দ্দিকে ১০ ঘণ্টায় ঘুরে আসছে, আর একটা একটু বেশী সময় নিচ্ছে—সাড়ে একুশ ঘণ্টা। গল্প লোকে খুব পড়ল, কিন্তু একে গল্প ছাড়া সত্য বলে কেউই বিশ্বাস করতে পারল না। করেই বা কি করে—যা সব আজগুবী গল্প ! বৈজ্ঞানিকেরা ত একেবারেই উড়িয়ে দিলেন। যারা এমনিতে মনে করতেন যে, মঙ্গল-গ্রহের নিশ্চয়ই উপগ্রহ আছে, তাঁরাও একে পাত্তা দিলেন না, গল্পে বললেই যদি তা সত্যি হয়, তা'হলে আর কি চাই !

যা হোক এমনি করেই ত চলছিল, এমন সময় প্রফেসর হল্ দুইটি উপগ্রহ আবিষ্কার করে সমস্ত জগৎকে থ বানিয়ে দিলেন। তোমাদের আগেই বলেছি, ১৮৭৭ সালে মঙ্গল পৃথিবীর খুবই কাছে এসেছিল। এই সময়ে অনেক নূতন নূতন আবিষ্কার হয়, মঙ্গলের মধ্যেকার খালগুলোর কথাও এই সময় সিয়াপেরিলি আবিষ্কার করেন। মিঃ হল্ও এই সময় মঙ্গল-গ্রহ নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তিনি তখনকার সব চেয়ে সূক্ষ্ম এবং বড় যন্ত্রপাতি ও দূরবীক্ষণ পান আমেরিকার এক কোম্পানীর কল্যাণে। এই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তিনি পিছপাও হলেন না। তাঁর ত আগেকার সব কথাই জানা ছিল। বৈজ্ঞানিক মহল নিশ্চিন্তভাবেই ঠিক করে

রেখেছিলেন যে, মঙ্গলের যদি কোন উপগ্রহ থাকে তা'হলে সে হবে খুবই ছোট। আমাদের চাঁদের শ-ভাগের একভাগের সমান হলেও বৈজ্ঞানিকদের এত খোঁজাখুঁজির পরেও আর লুকিয়ে থাকতে পারত না—ধরা পড়তেই হ'ত। মিঃ হল্ খুব মনোযোগের সঙ্গে অতি সূক্ষ্মভাবে এর চারদিক নিরীক্ষণ করতে সুরু করলেন। সেদিন ইংল্যাণ্ডের প্লিমাউথে বৈজ্ঞানিকদের সভা বসেছে, এমন সময় আমেরিকা থেকে সংবাদ এল—মিঃ হল্ মঙ্গলের উপগ্রহ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন; শুধু একটা নয়, দুটো। যার একটার কথা জানার জন্যে বৈজ্ঞানিকগণ কত পরিশ্রম করেছেন তার একটা নয় একেবারে দু-দুটো মিঃ হল্ আবিষ্কার করে ফেললেন! বুঝতেই পারছ, কি ভাবে তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন, সারা জগতের বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা। এতদিনে তাঁদের পরিশ্রম সার্থক হ'ল। তাঁদের গণনা এবং অঙ্কের নিয়মে যে এতটুকু কসুর হয় নি, তা দেখে তাঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

মঙ্গলের এই উপগ্রহগুলো তাদের মালিকের মত শুধু ছোটই নয়, তাদের ব্যবহারও আশ্চর্য্য রকমের। এমনি দেহের পরিমাণে যেমন এরা আমাদের চাঁদের কাছেই ঘেঁসতে পায় না, অন্যদিক দিয়েও তাই, দুইজনের মালিকদের যতই মিল থাক না কেন। এই ধর না কেন, ঘোরাঘুরির কথা। চাঁদ ত পৃথিবীর চারদিক ঘুরে আসতে নেয় প্রায় ২৭ দিন, কিন্তু এরা সে দিক দিয়ে

একেবারে ছেলেখেলা করছেন বললেই চলে। একজন যাঁর নাম হ'ল ডিমোস (Deimos) তাঁর লাগে মঙ্গলের চারদিক এক বার ঘুরে আসতে ৩০ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ৫৪ সেকেণ্ড অর্থাৎ আমাদের একটা দিনেই সে সারা মঙ্গলের চারদিক দিয়ে একবার বেড়িয়ে এল। আর একজন যিনি আছেন তিনি আবার আরও সরেস। তিনি এমনিতে ত ছোটই আছেন, আবার রয়েছেনও মঙ্গলের কাছে কাছেই—ঘুরপাকও খাচ্ছেন তেমনি জোরে জোরেই। তাঁর লাগে মাত্র ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ১৪ সেকেণ্ড অর্থাৎ মঙ্গলের নিজের মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে একবার ঘুরে আসতে (বা মঙ্গলের এক দিনে) ইনি মঙ্গলের চারদিক ঘুরে আসবেন তিনবার। এঁর নাম কি জান? এঁর নাম হ'ল ফোবস (Phobos)। ইনি নিজেই একক, এর মতনটি সৌরজগতে আর দেখা যায় নি। এত জোরে যে এদের কেউ ঘুরতে পারে, তা এর আবিষ্কারের পূর্ব্বে কেউ বিশ্বাসই করতে পারত না। কোন উপগ্রহ যে তার গ্রহের চেয়েও জোরে ঘোরে, তাও এর আগে দেখা যায় নি।

এদের ছোট বলেই শেষ করেছি, কিন্তু কত ছোট সে কথা তোমাদের বলি নি। তোমরা হয়ত ভাবছ, সৌরজগতের ব্যাপার যখন, তখন হয়ত লাখ খানেকের কাছেও যেতে পারে—অন্ততঃ হাজারের নীচে যে নয়ই সে ত ঠিকই। আসলে কিন্তু তা নয়, সৌরজগতের কথা ধরলে এরা একটা বিন্দু-বিসর্গও নয়।

আমাদের পৃথিবীর মাপেই এরা খুব ছোট। এখ:
গেছে যে, ফোবসের ব্যাস ১০ মাইল; ডিমোস আরও ছোট, ব্যাস হ'ল মাত্র ৫ মাইল—যদিও এ ছুটছে আস্তে আস্তে। অর্থাৎ এরা আমাদের পদ্মা নদীর অনেক চরের চেয়েও ছোট আর কি!—ঠিক যেন দুটো চিল মঙ্গলের চারদিকে বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। তোমরা মঙ্গলে যেয়ে এদের কেমন দেখবে অনুমান করতে পার? আমাদের চাঁদ মামা যেমন রাতে উঠে কোনদিন বা শীগগিরই ডুবে যান, আস্তে আস্তে বেশী রাত আকাশের গায়ে থাকেন—পূর্ণিমাতে ত সারা রাতই আকাশের গায়ে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। মঙ্গলে যেয়ে দেখবে, ফোবস পশ্চিম আকাশে উঠে পাঁচ ঘণ্টা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা আকাশের গায়ে থেকে ডুবে যাচ্ছে আর ডিমোস উঠল ত উঠলই—দিন দুয়েকের মধ্যে তার আর ডুববার নাম নেই।

একটা কথা হয়ত তোমাদের মনে থাকবে, এদের অদ্ভুত ধরণের নাম। এ নাম কেমন করে হ'ল জান? মিঃ হল্ দুটো উপগ্রহ আবিষ্কার করে ভাবতে লাগলেন, এদের কি নাম দেওয়া যায়। তিনি নিজে কিছু ঠিক করতে না পেরে এক বন্ধুর কাছে পরামর্শ চাইলেন। বন্ধুটি ছিলেন সাহিত্যরসিক, হোমারের ভক্ত, তিনি. হোমারের ইলিয়াড থেকে নাম বেছে দিলেন ডিমোস আর ফোবস। মিঃ হল্‌ও তাই স্বীকার করে এদের নাম দিলেন ডিমোস এবং ফোবস।

আমাদের বাইরে থেকে যতটা জানবার তা সবই প্রায় জানা হয়ে গেছে। এইবার তোমরা যাত্রা সুরু করতে পার। আশা করি, ভালয় ভালয় ফিরে এসে মঙ্গলবাসীদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সেখানকার বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সংবাদাদি দিয়ে সুখী করবে।

শুকতারার দেশ

রাতের বেলায় আকাশের দিকে তাকালেই তারার রাজ্যে দৃষ্টি যায় হারিয়ে। কত তারা—কেউ মিট-মিট করছে, কেউ জ্বল-জ্বল করছে, কেউ ছোট, কেউ বড়, কত রকমের, কত আকারের। সারা বৎসরই এমনিভাবে চলে—কোন একটা বিশেষ তারার দিকে তাই হয়ত তোমাদের চোখ পড়ে না।

এবার গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে তাকিয়ে দেখো। দেখবে, এই তারার দলের মধ্যে একটি তারা বর্ণে, ঔজ্জ্বল্যে যেন সবগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে—কোন কিছুতেই আশে পাশের তারাগুলোর সঙ্গে তার মিল নেই; রং তার কারুর সঙ্গে খাপ খায় না—চাকচিক্যে সে রয়েছে সবকে ছাড়িয়ে। এ যেন তারার রাজ্যের সেরা তারা! কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করলে দেখবে, একে প্রত্যেক দিনই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু ঠিক একই জায়গায় যেন নয়—প্রত্যেক দিনই একটু উপরে—আগের দিনের চেয়ে একটু উপরে জায়গায়, এ যেন আস্তে আস্তে উপরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। যত উপরে উঠছে ততই তার প্রতাপও যেন বাড়ছে, বর্ণ ততই উজ্জ্বল হচ্ছে—সব্বাইকে ছাড়িয়ে চলেছে। তা ছাড়া পরিমাপেও তার পরিবর্ত্তন এসে গেছে; আগে যে ছিল

এতটুকু সে আর এতটুকু নেই—এখন আরও বড় হয়েছে। আরও কিছুদিন ধরে লক্ষ্য কর—দেখবে, কেমন যেন একটু ভাটার ভাব, একটু একটু যেন মিইয়ে আসছে। আগের মত অত উজ্জ্বল আর নেই, আর আকাশের গায়ের ধাপটাও তার নীচে আসছে, সে একটু একটু নেমে আসছে। এমনি করে কমতে কমতে, নীচে নামতে নামতে—কতদিন পরে দেখা গেল সে আর কোথাও নেই—তার আর কোন খোঁজ-খবরই পাওয়া যাচ্ছে না।

তোমার বাবা কি দাদাকে জিজ্ঞাসা করলে বলবেন—ওটা হ'ল সন্ধ্যা-তারা। এই যে সন্ধ্যা-তারা—ইনি কিছুদিন দেখা দিয়েই আবার যে কোথায় পালালেন, আর কেনই বা পালালেন, সে হয়ত তোমরা ভেবেই ঠিক করতে পার না।

আচ্ছা, কিছুদিন পরে একটু সকালে উঠতে চেষ্টা কর। ঠিক ভোর হয় হয়—পাখীগুলো যখন ডাকছে, সেই সময়ে উঠে পূব আকাশের দিকে চেয়ে দেখ—দেখবে, ঠিক সন্ধ্যা-তারার মতই একটি তারা খুব জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে—অন্যগুলোর সঙ্গে তার কোন মিল নেই। এটিকেও দেখবে প্রথমে খুবই ছোট—উজ্জ্বলও তেমন নয়, কিন্তু দিনে দিনে আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে—আরও বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ঠিক সন্ধ্যা-তারাটির মত। এটিও আবার কতক দিন পরে আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ে, আস্তে আস্তে নীচে নামতে থাকে, তারপরে

শুক্রের কলা
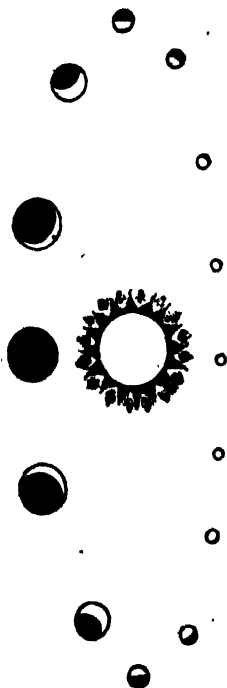
একেবারেই ডুবে যায়—তার আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না। এর বেলায় খোঁজ করলে শুনতে পাবে এর নাম হ'ল প্রভাতী তারা।

একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো, যখন পূব আকাশে প্রভাতী তারা দেখা যায় তখন সন্ধ্যা-তারার পাত্তাই পাবে না, আবার যখন সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যা-তারা দেখতে পাবে, তখন প্রভাতী তারার কোন খোঁজ-খবরই পাবে না। এমনি চলতে থাকে লুকোচুরি খেলা—আবার কতকদিন সন্ধ্যা-তারা বা প্রভাতী তারা কারুরই দেখা নেই, কোথায় যে তারা লুকিয়েছে!—আবার কিছুদিন পরে সন্ধ্যা-তারার দেখা পাওয়া গেল যথাস্থানে; আবার সেটাও লুকিয়ে গেল, কিছুদিনের জন্য কোন পাত্তাই নেই। কতদিন পরে পূব আকাশে প্রভাতী তারার দেখা মিলল। এমনি করেই চলতে থাকে বৎসরের পর বৎসর।

এই যে লুকোচুরি খেলে বেড়ান ইনি কে জান? ইনি হলেন শুকতারা। কখনও বা সন্ধ্যা-তারা রূপে দেখা দেন পশ্চিম আকাশে, আবার কখনও পূব আকাশে দেখা দেন প্রভাতী তারা হয়ে। আসলে সন্ধ্যা-তারাও যে প্রভাতী তারাও সে; শুধু সময়ের পার্থক্য—জায়গার বিভিন্নতা।

তোমরা হয়ত মনে করছ নাম যখন শুকতারা—তখন এও হয়ত একটা তারাই—এই যে হাজার হাজার তারা দেখা

যায় আকাশে, এ তাদেরই একজন মাত্র—আর কিছুই নয়। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো—অন্য তারাগুলোর সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য দেখতে পাবে। অন্য যে তারাগুলো দেখ সেগুলো সব সময়েই এক রকম, বড় ছোট হওয়া তাদের কপালে ঘটে উঠে না—একবার বেশী উজ্জ্বল আর একবার কম উজ্জ্বলও তাদের দেখা যায় না—সব সময়েই একই আকারের, একই রকমের—ঠিক যেন আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো। অথচ শুকতারার বেলায় কত পরিবর্ত্তনই না ঘটছে—একবার বড়, একবার ছোট, একবার উপরে, একবার নীচে।

এমনটি কেন হয় জান? আসলে ইনি তারা নন। তারার দলে দেখা গেলে কি হবে ইনি তাদের কেউ নন। হয়ত বা তারারা এঁর এমনি উঠা নামা ডোবা আর একে একবার উজ্জ্বল, একবার আঁধার দেখে মনে মনে হাসে—ঠিক তোমাদের ক্লাস-পালান ছেলেকে মধ্যে মধ্যে ক্লাসে আসতে দেখে তোমরা যেমন হাস আর কি! তা হাস্থক তাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, এরও নেই—ইনি ত আর তারাদের কেউ নন। যাদের সগোত্রের নন, যাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই, তাদের হাসাহাসিতে কি আসে যায়! আসলে ইনি কি জান? ইনি হলেন একটা গ্রহ; আমাদের পাড়া-প্রতিবেশী। চাঁদ মামার দেশের খবর নেবার সময় পৃথিবীর পাড়া-প্রতিবেশীর কথা তোমাদের হয়ত মনে আছে। আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে

কাছে রয়েছে দুটো গ্রহ ; একটা হ'ল মঙ্গল—পৃথিবীর এ পাশে, আর একটা হ'ল শুক্র—পৃথিবীর ওপাশে, সূর্য্যের কাছাকাছি। এই যে শুকতারাটি দেখছ, ইনি আর কেউ নন—ইনি হ্লেন আমাদের সেই প্রতিবেশী শুক্রগ্রহ।

এর এই সুন্দর রূপ আর দেহটি দেখে মানুষে অনেক আগে থেকেই একে ভালবাসতে সুরু করেছে। এমনি ত সুন্দর রূপ, তা ছাড়া এর উঠবার সময়টিও সুন্দর। সন্ধ্যার সময় মানুষের মন স্বভাবতই একটু প্রফুল্ল থাকে। তোমরা নিজেদের কথাই একবার ভেবে দেখ। স্কুল থেকে যখন এলে—তখন কেউ যদি এতটুকু কিছু করে তা'হলে কি বিরক্তিই না লাগে। হয়ত তোমার ছোট ভাই তোমার দোয়াত থেকে একটু কালি ফেলেছে—অন্য সময় তুমি এর জন্যে এতটুকু কেয়ার কর না, কিন্তু এখন আর এই অন্যায় কাণ্ডকে বরদাস্ত করতে পারলে না, দিলে ঠাস করে এক চড় লাগিয়ে—সে গেল কাঁদতে কাঁদতে। ঠিক খানিক পরেই খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে খেলার মাঠে গেছ—খেলে বেড়িয়ে ঘরে ফিরে আসছ, তখন কি ফুর্ত্তি—আগের সেই তিরিক্ষি ভাব আর নেই—সন্ধ্যার ফুরফুরে বাতাসে মনটা বেশ ঝিরঝিরে হয়ে রয়েছে—হয়ত বা আনন্দে গানই ধরেছ। এসে দেখলে তোমার ছোট বোন রেণু তোমার ছবির বইখানি—যা তুমি অন্য কাউকে দেখাতেই চাও না—নিয়ে খেলা করছে।

শুধু খেলা করলেও বা হ'ত—একখানা সুন্দর ছবিও ছিঁড়ে ফেলেছে। এবার কিন্তু তোমার তেমন রাগও হ'ল না, কি বোনকেও দু'ঘা লাগিয়ে দিলে না—মনটা বেশ ভাল আছে কিনা! এই সন্ধ্যার সময় মনটা যখন ভাল থাকে তখন এমনিই লোকে বাইরের দিকে চেয়ে দেখে—প্রকৃতির সুন্দর শোভা সব্বারই মনকে একটু টানে, এমনি সময় এই উজ্জ্বল তারাটি মানুষের ভাল না লেগে পারে না।

প্রভাতের সময়ও মানুষের মন সাধারণতঃ ভাল থাকে—স্নিগ্ধ সুবিমল বাতাস মনকে দেয় জুড়িয়ে, মানুষ একটু উৎফুল্ল হয়। এমনি সময় আকাশের এই উজ্জ্বল তারাটি মানুষের মনকে আকৃষ্ট না করে পারে না। তোমরা বড় হয়ে জানতে পারবে পুরাকালে গ্রীকরা একে কেমন দেবতা বলে পূজা করত। এর কারণ আর কিছুই নয়—এর সুন্দর রূপ, উজ্জ্বল বর্ণ আর উদয়ের সময়। অবশ্য এখন আর কেউ একে দেবতা বলে বিশ্বাস করে না।

তোমরা হয়ত শুনে থাকবে পৃথিবীতে যারা খুব ভাল কাজ করে তারা মরে গিয়ে আকাশের তারা হয় এবং মানুষকে পথ দেখায়। সে সব সত্যি কিনা তা নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর দরকার নেই—এখন এই শুকতারাটির সত্যিকার খবর আগে জানা যাক্। তার পর অন্য কথা ভাবা যাবে, কি বল?

তোমাদের আগেই বলেছি শুক্র রয়েছে পৃথিবীর ওপাশে

সূর্য্যের কাছাকাছি—অবশ্য এই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। এখানে যেতে হলে বিশেষ কষ্ট নাও পেতে হতে পারে—তবে সাবধান হতে হবে যেন চাঁদের হাতে ধরা পড়ে না যাও। শূন্য রাজ্যে একবার যেয়ে পৌঁছতে পারলে আর কথা নেই; তখন 'জোর যার মুল্লুক তার'—যার জোর বেশী হবে সেই টান দিয়ে নিজের মধ্যে নিয়ে যাবে। তখন হয়ত চাঁদ আর কোন পাত্তাই পাবে না, কিন্তু পৃথিবী থেকে শূন্য রাজ্যে যাবার সময় এ অমনি ছেড়ে দেবে না, টানাটানি সুরু করবে। তোমরা অনেকবারই টানাটানির কথা শুনেছ, হয়ত ভাবছ এটা কি? সময় নেই অসময় নেই শুধু টানাটানি—চাঁদে যাব পৃথিবী টানছেন, মঙ্গলে যাব পৃথিবী টানছেন, চাঁদ টানছেন—আবার শুক্রে যেতেও টানাটানি! এর কি ছাড়ান নেই? সত্যিই ছাড়ান নেই। এ কেন হয় তা তোমাদের আরও ভাল করে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করব। এখন শুধু এই জেনে রাখ যে, পৃথিবী থেকে শুক্রে যেতে হলে, চাঁদ তার জোর খাটিয়ে নিজের কোলে টানবার চেষ্টা করবেই, আর তার জোরটাও যে খুব কম তা বলা চলে না। তাই শুক্রে যাওয়ার যোগাড় করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে চাঁদ রয়েছে কোন্ খানে। চাঁদ যখন অন্যদিকে রয়েছে তখনই এই যাত্রাটা করা ভাল। বিপদ খানিকটা এড়িয়ে যাওয়া যাবে আর কি!

শুক্র যে পৃথিবীর খুবই কাছে আছে শুধু তাই নয়—অন্যান্য

দিক থেকেও এ পৃথিবীর মতই। বৈজ্ঞানিকেরা ত একে পৃথিবীর যমজ বোন বলেই নাম দিয়েছেন। সব কথা বিবেচনা করলে তোমরাও বলবে—হ্যাঁ নামটা বেমানান হয় নি, বরং ঠিকই হয়েছে। এই ধর না কেন—এর দেহটার কথাই। আমরা চাঁদকে দেখেছি, মঙ্গলকেও দেখেছি; দেহের পরিমাপে তারা কেউই পৃথিবীর কাছ দিয়েও ঘেঁসতে পারে না, কিন্তু ইনি আর অত ছোট নন—পৃথিবীর প্রায় সমান সমান! এর ব্যাস হ'ল ৭৭০০ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে ২১৮ মাইল মাত্র কম। এ কমটুকু ত ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। দেখা যাচ্ছে দেহের পরিমাপের দিক দিয়ে ইনি পৃথিবীর চেয়ে খুব খাট নন। এ ছাড়া আকার—আকারেও প্রায় তাই। এখন যা দেখা যায় আকারে ইনি ফুটবলের মতই গোলগাল নাদুস-নুদুস শরীরটি, তবে মনে হয় ঠিক গোলগাল বোধ হয় ইনি নন। উত্তর-দক্ষিণে একটু চাপা মতই হবে—এখনও ভাল করে ধরা পড়ে নি এই চাপাটা কতখানি, ঠিক পৃথিবীর মতই না তার চেয়ে কম। বেশী যে নয় তা ঠিকই। বেশী হলে অনেক আগেই ধরা পড়ত। এদিকেও পৃথিবীর সঙ্গে বেশ মিল আছে দেখা যাচ্ছে। শুধু দেহের পরিমাপ ও আকারই বা কেন,—ওজন? তোমাদের হয়ত মনে হচ্ছে, বাব্বা! ওজন—ওজন আবার কেমন করে ঠিক করা গেল? বৈজ্ঞানিকদের সব অদ্ভুত অদ্ভুত প্রক্রিয়া হয়ত এখন তোমরা ভাল করে বুঝতে পারবে না। বড় হয়ে

যখন বিজ্ঞান পড়বে তখন দেখবে এগুলো বিশেষ কঠিন কিছু নয়। তখন সব দেখে শুনে তোমাদেরও হয়ত মনে হবে এই সব ভদ্রলোকেরা যদি আগে থেকেই এসব আবিষ্কার করে না রেখে যেতেন তা'হলে ত আমরা এখন এগুলো আবিষ্কার করে বেশ নাম করতে পারতুম।

কেমন করে এসব ওজন জানা যায় তা সাধারণভাবে একটু জেনে রাখ, পরে বিশদভাবে সব জানতে পারবে। এই সব গ্রহ-উপগ্রহদের ওজন বের করতে হলে, তাদের গতিবিধি, পৃথিবী থেকে দূরত্ব, আর পৃথিবীর ওজন ইত্যাদির কথা জানলেই হ'ল, তা'হলেই ওগুলোর ওজনের কথা জানা যাবে। সাধারণতঃ এগুলোকে পৃথিবীর সঙ্গে তুলনামূলক ওজন করেই বুঝান হয়। আবার পৃথিবীর এই ওজনের স্বরূপ দেওয়া হয় গুরুত্ব দিয়ে— জলের সঙ্গে তুলনা করে। সমান পরিমাণ জল আর অন্য একটা জিনিস ওজন করলে, ধর জল হ'ল তিন সের আর অন্য জিনিসটা হ'ল পনের সের—অর্থাৎ জিনিসটার ওজন জলের ওজনের পাঁচগুণ। বৈজ্ঞানিকেরা বলবেন জিনিসটার আপেক্ষিক গুরুত্ব হ'ল পাঁচ। এমনি আমাদের পৃথিবীতে যদি আর কোন জিনিস না থেকে শুধু জল থাকত তা'হলে তার যা ওজন হ'ত তার চেয়ে এখনকার ওজন প্রায় পাঁচগুণ বেশী। পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব হ'ল পাঁচ। ঠিক এই রকম ভাবে শুক্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ'ল পৌনে পাঁচ। দুটো সমান জিনিস সব

দিক দিয়েই সমান—তার মধ্যে একটা যদি আর একটার চেয়ে কম ভারী হয় তা'হলে কি বুঝতে হবে? তোমরা এমনি বুঝতে পার তা'হলে এই হাল্‌কা জিনিসটায় অনেক জিনিসই বোধ হয় নেই। শুক্রের বেলায়ও তাই হয়েছে। শুক্র আর পৃথিবী সব দিক দিয়েই সমান, অথচ পৃথিবীর ওজন শুক্রের চেয়ে বেশী। তা'হলে ধরতে হবে শুক্রে পৃথিবীর মত এত জিনিস নেই। আসলেও তাই। হিসেব করে দেখা গিয়েছে পৃথিবীতে যত জিনিস আছে শুক্রে তার চেয়ে শতকরা উনিশ ভাগ কম জিনিস আছে, অর্থাৎ এখানে যদি হাজার মাইলের সমস্ত জিনিসের ওজন হয় ২০০০ মণ, তা'হলে ওখানকার হাজার মাইলের সমস্ত জিনিসের ওজন হবে ১৬২০ মণ—৩৮০ মণই কম।

তোমরা হয়ত ভাবছ ওজন কম হ'লই বা—তাতে আর কি আসে যায়? এমনিতে কিছু আসে যায় না বটে, কিন্তু একটা জিনিসে এতে অনেক বাদ সাধে; সেটা হ'ল টানবার শক্তি বা আকর্ষণ-শক্তি। তোমরা হয়ত নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের গল্প জান। তিনি একদিন আপেল গাছের নীচে বসে আছেন; দেখেন গাছ থেকে মাটিতে ফল পড়ছে। তখনই তাঁর মনে হ'ল—তাই ত, ফল মাটিতে পড়ে কেন? মাটিতে না পড়ে উপরেও ত যেতে পারত—এই নীচে পড়ার নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। তার পর ভেবে ভেবে ঠিক করে ফেললেন

যে, রহস্যটা আর কিছু নয়; সেটা হ'ল মাটি—সব সময়েই সে সব জিনিসকে নিজের দিকে টানছে। এই হ'ল মাধ্যাকর্ষণ। নিউটনের আগেই একজন মুসলমান বৈজ্ঞানিক এটা ঠিক ধরে ফেলেছিলেন এবং সেই অনুসারে কতক কাজও করেছিলেন। কিন্তু তার পরে আর এবিষয়ে কেউ চর্চ্চা করেন নি বলেই এটা চাপা পড়ে গেছিল। যাক্, এসব তোমরা বড় হলে ভাল করে জানতে পারবে।

এই যে টানাটানির ব্যাপার এ শুধু আমাদের পৃথিবীতেই আটকে নেই। শুধু পৃথিবীই টানছে না, সব জিনিস সব সময় সব জিনিসকেই টানছে। পৃথিবী চাঁদকে টানছে, চাঁদ পৃথিবীকে টানছে। তেমনি সূর্য্য পৃথিবীকে টানছে, পৃথিবীও সূর্য্যকে টানছে—শুক্র পৃথিবীকে টানছে, পৃথিবীও শুক্রকে টানছে। শুধু এদের মধ্যেই টানাটানি নয়, দুনিয়াভর সর্ব্বত্রই এই টানাটানি। তুমি আমাকে টানছ, আমিও তোমাকে টানছি—তবে নিতান্ত অলক্ষ্যে—এ আর আমরা বুঝতেও পারি না; শুধু একজন যখন আর একজনকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যায় তখনই বোঝা যায়, হ্যাঁ সত্যিই টানছে। একটা ঢিল ছুঁড়ে দাও উপরের দিকে, ঢিলকে পৃথিবী টানা সুরু করে দিল, কিন্তু ঢিলও ছেড়ে দিল না—সেও টানা সুরু করল। এখন দেখতে হবে—কে হারে কে জিতে। তোমাদের কি মনে হয়? যার গায়ে জোর বেশী সেই ত জিতবে। তাই ঢিল আর কিছু

করতে পারে না—বেচারাকে বাধ্য হয়েই নীচে নেমে আসতে হয়। পৃথিবীর মত শক্তিশালী জিনিসের কাছে তার কোন জারিজুরিই খাটে না; কিন্তু পৃথিবীতে যদি কোন কিছু না থাকত, এটা একেবারে খালি ফাঁপা হ'ত, তা'হলে আর তার এ শক্তি বলতে কিছুই থাকত না।

টানবার শক্তি নির্ভর করে নিজের শক্তির উপরে। আবার নিজের শক্তিটাও নির্ভর করে ভিতরে কতখানি জিনিস আছে, তাদের কেমন ওজন তারই উপর। তা'হলেই বুঝতে পারছ শুক্র এমনি সব দিক দিয়ে পৃথিবীর সমান হয়েও এখানে কেমন একটু খাট হয়ে গেছে। তার ভিতরকার জিনিসের ওজন কম, অতএব শক্তিও কম। সেই অনুসারে তার টানবার ক্ষমতাও কম। টানবার শক্তি কেমন কম তা একটা জিনিসেই তোমরা বুঝতে পারবে।

তোমরা চাঁদে যাওয়ার বেলায় দেখেছ, পৃথিবীর টানকে ছাড়িয়ে যেতে হলে কত বেগে এখান থেকে হাওয়াই জাহাজ ছাড়তে হবে। এমন জোরে যে, ঘণ্টায় যেন ২৫২০০ মাইল যেতে পারে বা সেকেণ্ডে প্রায় সাত মাইল। মঙ্গলেরও টান আছে, কিন্তু তার টানকে ছাড়াতে হলে বেশী জোরের দরকার হয় না—সেকেণ্ডে তিন মাইল বা ঘণ্টায় দশ হাজার পাঁচশ' মাইল ছুটতে পারলেই যথেষ্ট। শুক্রের বেলায় যদিও অত কম নয়, তবে আমাদের পৃথিবীর সমানও নয়। এখান থেকে ঘণ্টায়

বাইশ হাজার পাঁচশ' মাইল জোরে ছুটতে পারলেই হয়—তা হলেই একদম পগার-পার। এখানে ইনি কেমন কমে গেছেন, শুধু ভিতরকার জিনিসের ওজন কমের জন্যেই। বুঝতেই পারছ এই জিনিসটা একেবারে ফেলবার নয়। তোমাদের সঙ্গে শুক্রের কোন লোকের যদি ঝগড়া বেধে যায়—তা'হলে তাকে কোন রকম করে তোমাদের হাওয়াই জাহাজে উঠাতে পারলেই হয়—একেবারে কেল্লা ফতে—সোজা নিয়ে আসবে দেশের মাটিতে। কিন্তু ওদের দেশের লোকের বেলায় তা হবার যো নেই। তারা যদি কোনক্রমে তাদের হাওয়াই জাহাজকে ঘণ্টায় সাড়ে বাইশ হাজার মাইল যাওয়ার মত শক্তিশালী করে নিয়ে তোমাদের এখানে হানা দিতে চায়—তা'হলে তারা এখানে চলে আসতে পারবে ঠিকই, কিন্তু এখান থেকে আর ফিরে যেতে হবে না। তোমরাও তখন মনের সুখে পিটিয়ে নিতে পারবে—যার মাটি তার লাঠি!

টানাটানির কথা এখন ছেড়ে দেওয়া যাক্, সে না হয় পরে হবে। এখন মানুষের মত সত্যিই কেউ শুক্রে আছে কিনা সেইটেরই খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। উপায়গুলো ত আগে থেকেই জানা আছে, ভাবনার বিশেষ কোন কারণ নেই, এখন শুধু সুবিধেমত খাটিয়ে নেওয়া। তোমাদের একটা সুসংবাদ দিচ্ছি যে, এখানে বোধ হয় জলের কোন অভাব হবে না, চাঁদ আর মঙ্গলে জলের যা দুর্ভিক্ষ! চাঁদে ত নেই বলতে কিছুই

নেই আর মঙ্গলও অনেকটা তথৈবচ, কিন্তু শুক্র এই দুইকেই ছাড়িয়ে গেছে বলতে হবে। বলতে কি, এর উপরটা সব সময় মেঘে ঢাকা। এ মেঘের মধ্য দিয়ে ভিতরের কিছু দেখতে পাওয়াই শক্ত। শুক্র সূর্য্যের কাছাকাছি, সে-কথা তোমাদের আগেই বলেছি। তাই এটা আমাদের পৃথিবীর চেয়ে একটু গরম। এর উত্তাপ আমাদের পৃথিবীর গড় উত্তাপের চেয়ে প্রায় ৯০° ডিগ্রী বেশী। কিন্তু উত্তাপ বেশী হলে কি হবে, এ উত্তাপে জল জলই থাকে—বাষ্প হয়ে একেবারে উড়ে যেতে পারে না। জল বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে হলে আমাদের পৃথিবীতে ২১২° ডিগ্রী তাপের দরকার—এর চেয়ে কমেও হতে পারে, যদি উপরের বাতাসের চাপ কম হয়। কিন্তু শুক্রে সে চাপটা যে খুব বেশী কম তা ত নয়; তাই এর জল বাষ্প হতে প্রায় ২০০° ডিগ্রীর কাছাকাছি তাপ লাগবে। এমনিতে শুক্রের উপরকার গরম ত আর এত বেশী নয়, তাই জলের এখানে অভাব নেই; তবে আমাদের এখানকার মত ঠাণ্ডা যে নয় তা ঠিকই—অনেকটা গরম—হয়ত বা খেতে একটু কষ্ট হবে। তা তাতে আর বিশেষ কি আসে যায়, আমাদের এখানে মরু-ভূমিতেও লোকে বাস করছে। যা হোক, এই গরম জল থেকে সব সময়েই যে বাষ্প উঠছে তাতেই করছে মেঘের সৃষ্টি। সেই মেঘই রয়েছে শুক্রের উপরটা ঘিরে, সব সময়েই একটা আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে।

যাক, জল যে আছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। মেঘ যখন রয়েছে তখন জল থাকবেই আর জল থাকলে তাদের থাকবার জায়গাও ত চাই—নদী সমুদ্র এসব না হলে আর থাকবে কোথায়? আশা হচ্ছে তা'হলে আমাদের পৃথিবীর দৃশ্যাবলীর মতই এখানেও সব দেখতে পাওয়া যাবে। জলের ত একটা গতি হ'ল—আর এখান থেকে ঘটি ঘটি জল নিয়ে যেতে হবে না; কিন্তু বাতাস—বাতাসের কি বন্দোবস্ত?

পণ্ডিতেরা এখানেও আশ্বস্তি দিচ্ছেন বটে, তবে তেমন জোরে-সোরে নয়—অনেকটা মাথা চুলকিয়ে চুলকিয়ে। তাঁরা বলছেন—"দেখ বাতাস আছে বটে, কিন্তু বেশী নয়—আমাদের পৃথিবীতে যেমনটা পাবে এখানে তেমনটি পাবে না। সব জায়গায় কি আর সমান পাওয়া যায়? তবে আছে যে সেটা ঠিকই বোধ হচ্ছে।" কেমন করে তাঁরা সেটি বুঝতে পারলেন তা তোমাদের জানতে হয়ত আমোদ লাগবে। অন্যগুলোর বেলায় যেমন, এখানে কিন্তু ঠিক সেই পন্থাটি খাটে নি। বুঝতেই পারছ, কেন। এর উপরটা রয়েছে মেঘ আর কুয়াশায় ঢাকা—এই মেঘ আর কুয়াশা ভেদ করে ভিতরের জিনিস পৃথিবীতে বসে দেখা সম্ভবপর নয়। এমনি আমাদের পৃথিবীতেই দেখ না। যখন খুব কুয়াশা হয় তখন সম্মুখে কি আছে তা আর নজরেই আসে না—কতজনের সঙ্গে যে টক্কর খেতে হয়! অবশ্য আমাদের বাংলাদেশে তেমনটি খুব কমই হয়, কিন্তু শীতপ্রধান

দেশে এমনটি প্রায়ই হচ্ছে। তোমাদের বিলাতফেরত আত্মীয়দের জিজ্ঞাসা করলেই কথাটা কতখানি সত্যি তা বুঝতে পারবে। এমনি কাছাকাছিই যখন এই অবস্থা তখন এই আড়াই কোটি মাইল দূরে যে রয়েছে তার সম্বন্ধে জানতে যে কি কষ্টটাই হবে সে ত বুঝতেই পারছ। তা ছাড়া সম্বলের মধ্যে ত এই দূরবীক্ষণ—এর উপর নির্ভর করেই সব কিছু করতে হচ্ছে।

এই সঙ্গে একটা কথা ভেবে দেখ। শুক্রে যদি আমাদের মত মানুষ কেউ থাকে তা'হলে তার কি অসুবিধাই না হচ্ছে! সে কোন সময়েই আকাশের মুখ দেখতে পায় না; এমন সুন্দর আকাশ, তারা দিয়ে সাজানো নীল রংএ ছাওয়া এর কোন কিছুই তার নজরে আসছে না। সে শুধু দেখছে মেঘ, মেঘ আর মেঘ—এ মেঘের আর সীমা-পরিসীমা নেই, একের পর এক রয়েছে সমস্ত আকাশ জুড়ে। তার অবস্থা ঠিক যেন পর্ব্বতের গুহায় বন্দীর অবস্থা; কোন সময় বাইরে আসতে পারছে না, তাই উপরে যে কি আছে তার আর কোন খোঁজ-খবরই পাচ্ছে না।

যাক্ শুক্রের বাতাসের কথা বলছিলুম। এখানকার বাতাসের খবর নেওয়া হয়েছে অন্য রকম ভাবে। নীচের বাতাসের খবর ত আর পাওয়া যায় নি; শুধু উপরকার বাতাসের খবর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে আর কি! যদি

কোনদিন শুক্রে যাওয়া যায় তবেই এখানকার সব খবর পাওয়া যাবে, নইলে এই অল্পেতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে.। আসল যা সব জিনিস সে ত থাকে নীচেকার স্তরেই, তবুও কি আর করা যায়? এই উপরকার বাতাসের খবর নেওয়া হয় শুক্র থেকে যে আলো আসছে তা থেকেই। যে আলোতে এর মেঘগুলো দেখা যাচ্ছে সে আলো ত উপরকার বাতাসের ভিতর দিয়েই আসছে। এই বাতাসের ভিতর দিয়ে আসতে তার অনেক কিছু রদবদল হয়ে যায় বাতাসের ভিতরকার জিনিসের মারফতেই। তাই বাতাসে যে জিনিস আছে তার পরিচয় পাওয়া যায় এই রদবদল থেকেই। এই সব পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, শুক্রের উপরকার বাতাসে জলের বাষ্প আর অক্সিজেন খুবই কম। জলের বাষ্প কম থাকাটা আশ্চর্য্য নয়। আমাদের পৃথিবীর উপরকার বাতাসেও জলের বাষ্প এমনি নেই বললেই চলে। বাতাসের ঘূর্ণিপাকে পড়ে জলের বাষ্পগুলো সব সময়েই নীচের দিকেই থাকে; তাই আর এদের উপরে বড় একটা দেখা যায় না। তা ছাড়া এঁরা নীচেই ত সব একেবারে জমাট বেঁধে রয়েছে—মেঘ হয়ে—তা আর উপরে আসবে কোত্থেকে! কিন্তু অক্সিজেন—আমাদের পৃথিবীতেও বাতাসের চারভাগের এক-ভাগ অক্সিজেন—এ অক্সিজেন দেখতে পাওয়া যায় পৃথিবীর উপরকার বাতাসেও। সেই নজির অনুসারে শুক্রের উপরের বাতাসেও যদি এমনি দেখা যেত তা'হলে ঠিক বোঝা যেত যে,

হ্যাঁ এর নীচেও অক্সিজেন বেশ আছে। উপরে না থেকেও নীচে থাকতে পারে, সেটা সম্ভবপর নয়—এ ত জলের বাষ্পের মত নয় যে বাতাসের ঘূর্ণিপাকে পড়ে নীচে চলে যাবে।

বাতাস যে শুক্রে বেশ আছে সে অন্য ভাবেও দেখা গিয়েছে, সেটা তোমাদের পরে বলব। কিন্তু বাতাস থাকলে কি হবে—এতে অক্সিজেন নেই। তোমরা হয়ত আশ্চর্য্য হচ্ছ —তাই ত, বাতাস আছে আর তাতে অক্সিজেন নেই তা কেমন করে হতে পারে? হওয়াটা তেমন অসম্ভব নয়—ব্যাপারটা হ'ল কি জান? এই আমরা মানুষ জীব-জন্তু যেমন অক্সিজেন খুবই চাই—অক্সিজেন পেলেই তাকে টেনে নেব, অন্য অনেক জিনিসেরও তেমনি অক্সিজেনের প্রতি খুব টান আছে। সত্যিই যে তেমন আকর্ষণ আছে তোমরা সে খবর এমনিও পেতে পার। একখানা লোহা কিছুদিন ফেল রাখ। কয়েকদিন পরে দেখবে তাতে মরিচা ধরে গেছে। মরিচাটা আসলে কি জান? এটা হ'ল লোহার সঙ্গে বাতাসের রাসায়নিক সংমিশ্রণ—লোহাটা বাতাস থেকে খানিকটা অক্সিজেন নিয়ে তার সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ীতে যে রান্নাবান্না হয়, এও অক্সিজেন নিয়েই কারবার। পোড়ান মানেই হ'ল অক্সিজেন ব্যবহার করা—অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। তাই এমনি যদি অক্সিজেন খরচই হতে থাকে তা'হলে আর এ কতদিন থাকতে পারে—আপনিই ফুরিয়ে যেত, হয়ত

আমাদের পৃথিবীর বাতাসেও অক্সিজেনের অভাব দেখা দিত। আসলে হ'তও তাই যদি এখানে গাছপালাগুলো না থাকত।

গাছপালাগুলো থাকাতেই আমরা অক্সিজেন পাচ্ছি। সে কেমন করে হয় তা তোমাদের মঙ্গলগ্রহের কথা বলবার সময় বলেছি। শুক্রে যে অক্সিজেনের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যাচ্ছে না তাতে মনে হয়, এখানে গাছপালা বোধ হয় তেমন কিছু নেই—থাকলে আর এ দুরবস্থা হবে কেন ?

যাক্ শুক্রে বাতাস যে আছে তা কেমন করে বোঝা যায় পণ্ডিতদের সেই কথাটাই শোনা যাক্। তোমাদের আগেই বলেছি শুক্র আছে পৃথিবীর ওপাশে সূর্য্যের কাছাকাছি। তোমরা হয়ত জান আমাদের এই গ্রহগুলো সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে—তাকে কেন্দ্র করে সব্বাই ঘুরছে। তা'হলে যে কাছাকাছি থাকবে তার এই ঘোরার পথটাও ছোট হওয়া উচিত। আসলে হয়েছেও তাই—বুধের পথ সব্বার চেয়ে ছোট; তার চেয়ে বড় হ'ল শুক্রের, তার চেয়ে বড় পৃথিবীর—এমনি করেই চলছে। যার পথ ছোট হবে ঘুরতেও তার সময় লাগবে কম, অবশ্য যদি তার গতিটা একেবারে শম্বুকগতি না হয়। আস্তে আস্তে চললে আর সে শীগ্গির ঘুরে আসবে কি করে ? পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় তার নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরে ৩৬৫ দিনে সূর্য্যকে ঘুরে আসে—মঙ্গল সাড়ে তেইশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরে ৬৮৭ দিনে

সূর্য্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে। শুক্রের বেলায়ও এমনি একটা কিছু হওয়া উচিত। প্রথমে তার নিজের মেরু-দণ্ডের উপর একবার ঘুরবে, তার পরে সূর্য্যের চারদিকে একবার ঘোরা। কিন্তু প্রথমটাতেই গোলমাল বেধে গেছে। প্রথম প্রথম বৈজ্ঞানিকেরা ত মনে করেছিলেন যে, এটা ২২ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরে আসে অর্থাৎ তার দিন-রাত পৃথিবীর মত ২৪ ঘণ্টায় না হয়ে ২২ ঘণ্টায় হবে। এ কিন্তু তাঁরা ধরে নিলেন একেবারে অনুমানের উপর নির্ভর করে। এ যে কেমন করে তার মেরুদণ্ডের উপর ঘুরছে সেইটাই তাঁরা ঠিক করতে পারলেন না। সেটা কেমন করে ঠিক করা যায় তাই তোমাদের বলছি।

একটি গোলগাল বল নিয়ে তার এক জায়গায় বেশ একটা চিহ্ন দিয়ে দাও। এইবার বলটা ঘুরাতে থাক। যদি বলটা এমনি ঘুরতে থাকে তা'হলে এই দাগটা একবার তোমার সম্মুখে আসবে আবার দূরে চলে যাবে। বলটা যদি একইভাবে ঘুরতে থাকে তা'হলে ঠিক একই সময় বাদে বাদে এ দাগটাও তোমার কাছে এসে পড়বে। এখন উল্টো দিক থেকে বিবেচনা কর— যদি এই দাগটা সব সময় দেখতে না পাও বরং ঠিক সমান সমান সময় বাদে দেখতে পাও তা'হলে কি বুঝবে? তা'হলে আপনিই বুঝতে পারবে যে বলটা ঘুরছে।

এইবার গ্রহগুলোর বেলায়ও এই পন্থাই অবলম্বন কর।

যে গ্রহটার খবর চাও তার উপরও একটা জায়গা ঠিক করে নাও যাতে সহজে জায়গাটা চেনা যায়। এখন দূরবীক্ষণ দিয়ে এই জায়গাটার উপর লক্ষ্য করতে থাক। দেখছ জায়গাটা যেন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে—আরও খানিক পরে আর সেগুলোর পাত্তাই নেই। এমনি ভাবে ২২ ঘণ্টা কেটে গেল—তারপর আবার সেই জায়গাটা দেখতে পেলে—সেই জায়গাটা আবার ফিরে এসেছে। বলটার কথা থেকেই বুঝতে পারছ এ এই বাইশ ঘণ্টায় একবার নিজের চতুর্দ্দিকে ঘুরে আসছে। শুক্রের বেলায় বৈজ্ঞানিকেরা ত এমনি কোন চিহ্নই ঠিক করে নিতে পারলেন না—একটা হিজিবিজি কিছু নিয়ে সুরু করলেন, কিন্তু তেমন হিজিবিজি এর আরও অনেক জায়গায় আছে তাই সঠিক ভাবে কিছুই নির্ণয় করে উঠতে পারলেন না। এ সমস্যা থেকে উদ্ধার করলেন ইটালীয় বৈজ্ঞানিক সিয়াপেরিলি। তিনি অনেক কষ্টে অনেক পরিশ্রমে দুটো চিহ্ন ঠিক করে নিলেন শুক্রের গায়ে আর এই দুটোকে লক্ষ্য করতে লাগলেন ; এদের কেমন ব্যবহার—এরাও কি মঙ্গলের চিহ্নগুলোর মতই খানিক পরে অদৃশ্য হয়ে যেয়ে আবার কয়েকঘণ্টা পরে উদিত হয় না এমনি থাকে। ভদ্রলোক দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন যে, এদের অদৃশ্য হওয়ার নামগন্ধও নেই—যেমনকার তেমনি আছে, সব সময়েই তাদের পাওয়া যাচ্ছে—তিন-চার মাস ধরে আর কোন রদবদলই হ'ল না।

তিনি ত ভারী মুস্কিলে পড়ে গেলেন—তাই ত, এ কি হ'ল! ভাবতে লাগলেন ব্যাপারটা কি, কেমন করেই বা এটা হতে পারে! শেষে স্থির করলেন হয়ত এ চাঁদের মত একটা পিঠ সব সময়েই সূর্য্যের দিকে ধরে রয়েছে আর তেমনি ভাবেই ঘুরছে। বুধ গ্রহটাও ঠিক এমনি ভাবে ঘোরে আর সেই জন্যেই তার পিঠে সব সময়েই রাত আর অপর পিঠে সব সময়েই দিন। শুক্রের বেলায়ও তেমন হওয়া বিচিত্র নয়—বুধেরই ত প্রতিবেশী। এখানে এসেও খটকা বেধে গেল। তোমরাও বলতে পারবে কিসের এ খটকা? ইনি ত শুধু বুধেরই প্রতিবেশী নন, আমাদের পৃথিবীরও প্রতিবেশী; তা'হলে পৃথিবীর মতই বা হবে না কেন? হ্যাঁ সেটাও ঠিক। তা'হলে তার এই রকম চলাকে পৃথিবীর সঙ্গে মানিয়ে ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হবে যে এ নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরছে বটে কিন্তু এত আস্তে যে, সেটা সহজে ধরাই যাবে না। হয়ত বা এখানেও এর সব দিকেই আমাদের পৃথিবীর মত দিন-রাত হয়, কিন্তু এ দিনরাত-গুলো অনেক বড় বড়।

সিয়াপেরিলি শেষ পর্য্যন্ত সাব্যস্ত করলেন যে, এ ২২৫ দিনেই একবার এর মেরুদণ্ডের উপরেও ঘুরে আসে—অর্থাৎ তা'হলে এর একদিন এক রাতেই এক বৎসর কাবার—শুক্র সূর্য্যের চারদিকেও ২২৫ দিনে ঘুরে আসে কিনা। দেখা যাচ্ছে ঠিক আমাদের মেরুপ্রদেশের দিনরাতের মতই

এরও তা'হলে হবে ছ' মাস দিন আর ছ' মাস রাত। অনেকেই একথাটা মেনে নিয়েছেন, অবশ্য কেউ কেউ যে প্রতিবাদ করেন নি তাও নয়। যাই হোক, শুক্র সব সময় এক মুখ সূর্য্যের দিকে দিয়ে ঘুরুক কি ২২৫ দিনে একবার নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরে আসুক, আসলে ফল দাঁড়াবে প্রায় একই। এর একটা গোলার্দ্ধ হবে খুবই গরম আর অন্য একটা হবে খুবই ঠাণ্ডা, স্যাৎস্যাতে অথবা প্রত্যেক গোলার্দ্ধই কিছুদিন থাকবে খুবই গরম আর কিছুদিন থাকবে একেবারে ঠাণ্ডা স্যাঁৎস্যাঁতে।

শুক্র আর পৃথিবী দুটোই সূর্য্যের চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছে, অবশ্য শুক্র পৃথিবীর চেয়ে জোরে জোরেই ঘুরছে। এই রকম ঘুরতে ঘুরতে তিনজনেই সময়ে সময়ে এক লাইনে এসে যাবে। কেমন করে হয় সে তোমরা নিজেরাই দেখতে পার। একটা খুঁটির চারদিকে পাশাপাশি দুটো বৃত্ত টেনে নাও। তারপরে দুজনে এই দুটো বৃত্ত ধরে দৌড়তে থাক। দেখবে তোমরা দুজনে সময়ে সময়ে একই লাইনে এসে একজন আর একজনকে ধরে ফেলবে তা একজন যতই জোরে দৌড়াও আর অন্য একজন যতই আস্তে দৌড়াও না কেন। এমনি ভাবেই ঘুরতে ঘুরতে সূর্য্য, পৃথিবী আর শুক্র যখন একই লাইনে এসে যাবে তখন ব্যাপারটা কেমন হবে ভেবে দেখ।

পৃথিবী থেকে শুক্রকে দেখলে একে তখন ঠিক সূর্য্যের

উপরেই দেখা যাবে—আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল। এমনি ত আর শুক্রের নিজের কোন আলো নেই, সূর্য্যের আলোতেই এর আলো ; তাই যখন সূর্য্যের উপরেই এসে গেছে তখন যে আরও উজ্জ্বল দেখাবে সে ত সহজেই বুঝা যায়। সূর্য্যের তুলনায় এ অনেক ছোট, সেই হিসেবে একে দেখাও যাবে একটা বিন্দুর মতই খানিকটা জায়গা জুড়ে। এই যে সূর্য্যের উপর দিয়ে শুক্রের গতিপথ একে বলে ট্রানসিট্ ফর ভেনাস্ (Transit for Venus)। এই সময়ে এর অনেক কিছুই ভালভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে ; অনেক নূতন তথ্যও ভালভাবে জানা যেতে পারে। আসলেও অনেক পরীক্ষা এই সময়ে করা হয়েছে। এই রকম পরীক্ষার সময় দেখা গিয়েছে যে, চাঁদ আর বুধের সঙ্গে শুক্রের অনেক পার্থক্য। সূর্য্যের উজ্জ্বল দেহের সামনে এসে পড়া থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত একে দেখা যায় এক সুন্দর আলোবেষ্টিত একটা কালো থালার মত। এই সুন্দর আভাটা হতে পারে বাতাসে সূর্য্যের আলো প্রতিসরিত হওয়ার জন্যেই। এতেই বোঝা যায় যে, এখানে বাতাস আছে। চাঁদ আর বুধের বেলায় কিন্তু এমন কিছু দেখা যায় না—তাদের শুধু কালো থালার মতই দেখা যায়, কোন আলোর বেষ্টনীর সন্ধান সেখানে পাওয়া যায় না। যদি তাদের মধ্যেও এমনি বাতাস থাকত তা'হলে সূর্য্যের আলো প্রতিসরিত না হয়েই পারত না—তখন তাদেরও

চারদিকে এমনি একটা আভা দেখা যেত। তোমরা যখন আলোর কথা পড়বে তখন দেখবে এ কেমন ভাবে প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয়। এ ছাড়া অন্য উপায়েও অবশ্য জানা গেছে যে, চাঁদ আর বুধের মধ্যে বায়ুর লেশমাত্রও নেই।

তোমাদের কেউ কেউ হয়ত ভাবতে পার যে, তা'হলে এর পরের ট্রানসিট্এ বেশ ভাল করে দেখা যাবে কথাগুলো সত্যি কিনা। সেটা ভালই, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কয় জন যে এর পরের ট্রানসিট্ দেখতে পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সাধারণ হিসেবে প্রত্যেক আট বৎসর বাদে এই ট্রানসিট্ দেখতে পাওয়া উচিত। পৃথিবী যখন পূর্ণ আটবার সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে আসে—শুক্র তখন পূর্ণ তের বার এর চারদিকে ঘুরে আসে। সে হিসেবে আমাদের প্রত্যেক আট বৎসর বাদেই এদের তিন জনের একই লাইনে এসে পড়া উচিত। কিন্তু অনেক কারণে তা হয় না। পণ্ডিতেরা হিসেব করে দেখেছেন, এর পরের ট্রানসিট্ হবে ২০০৪ সালে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অতদিন জীবিত থাক তা'হলে এ সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাবে বৈ কি? অবশ্য এমনি চোখে দেখতে পাবে না তা মনে রেখো; দূরবীক্ষণ দিয়ে ভাল করে দেখতে হবে।

জলবায়ুর সংবাদ ত পাওয়া গেল। বায়ু হয়ত তেমন পাওয়া যাবে না; সেজন্য বন্দোবস্ত করে যেতে হবে। এবারে কিন্তু মুস্কিল আছে। চাঁদে আর মঙ্গলে ত জলবায়ুর

পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বিশেষ অসুবিধা হয় নি বরং অনেকটা স্বচ্ছন্দেই বেড়ান গিয়েছিল, কিন্তু এখানে সেটি হবার যো নেই। এখানে ওজন যে বিশেষ কমবে তেমন ভরসাই নেই, এতে ওজন অনেকটা পৃথিবীর মতই থাকবে। অবিশ্যি একেবারে যে কমবে না তা নয়, তবে যেটুকু কমবে সে আমাদের পৃথিবীর মাপ অনুসারেও ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

জল, বায়ু থাকলেও মাটি কিছু আছে কি?—না চাঁদের মত এখানেও ছাইয়ে ভরা? কথাটার এখনও মীমাংসা হয় নি। কারণ হয়ত আর বলতে হবে না—একেবারে কিছুই দেখা যায় না যে মেঘের পাহাড় ভেদ করে তা মাটি আছে কি ছাই আছে কেমন করে বোঝা যাবে? তবে কেউ কেউ অনুমান করেন—এখানেও চাঁদের মত পাহাড়ভরা মরুভূমি দেখতে পাওয়া যাবে, তবে সেটা একেবারে চাঁদের মত শুকনো নয় বরং অন্য রকমের। শুকনো যে নয় সে ত মেঘ দেখেই বোঝা যায়, কি বল? তোমরা যেয়ে সংবাদ নিয়ে এলেই বৈজ্ঞানিকেরা আশ্বস্ত হতে পারবেন একটা কিছু নিশ্চিন্ত খবর পেয়ে, নইলে যেমন হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে মরছেন তেমনি থাকবেন। কেউ বলবেন হয়ত আছে, কেউ বলবেন হয়ত নেই! এই হয়ত নিয়ে ত আর চিরকাল চলবে না। আশা করি এইবারে তোমরা একটা কীর্ত্তি করতে পারবে এ সংবাদটা এনে।

এইবার আসল কথাটা বলা যাক্। এখানে মানুষের মত

কাউকে দেখতে পাওয়া যাবে কি?—না একেবারেই ফাঁকি? জল ত আছেই, তাই জলের জন্য শুকিয়ে মরতে হবে না। মানুষ থাকতে বিশেষ কষ্ট নেই। মাটিও না হয় ধরে নিলুম আছেই; যার সত্যি সত্যি থাকা না থাকার প্রমাণ নেই তাকে ধরে নেওয়াটা বিশেষ অসুবিধের নয়—অন্ততঃ না থাকার প্রমাণ যখন কেউ দিতে পারছেন না! ধরলুম আছে। এখন বাতাস —অক্সিজেন? এইটেই মুস্কিল। অক্সিজেন না থাকলে আমাদের মত মানুষের এক মুহূর্ত্তও চলতে পারে না। সেই অক্সিজেন যদি না থাকে তা'হলে আর মানুষ থাকবে কি করে? তবে কথা হ'ল যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীব এখানে থাকতে পারে কিনা—আর যদি এখন এতে হানা দিয়ে কোন রকমে দখল করে রাখা যায় তা'হলে পরে এখানে বসবাস করা চলবে কিনা। তোমাদের কি মনে হয়?—হয়ত চলতে পারে। কারণ দেখা যাচ্ছে, বাতাস এখানেও আছে, অক্সিজেনও ছিল; কিন্তু আর সব জিনিসের রাক্ষুসে ক্ষুধার কাছে আর বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে নি—সবগুলো ব্যবহৃত হয়ে গেছে। অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়ে সাধারণতঃ কার্ব্বন-ডায়অক্সাইড হয়। এই কার্ব্বন-ডায়অক্সাইড থেকে সহজেই অক্সিজেন ফিরে পাওয়া যেতে পারে গাছপালার সাহায্যে। অতএব এই শুকতারার দেশকে মানুষের বাসোপযোগী করে তোলবার একমাত্র উপায় হচ্ছে এখানে অনেকগুলো গাছপালা লাগিয়ে দেওয়া।

গাছেরা এই সব কার্ব্বন-ডায়অক্সাইড শুষে নিয়ে কার্ব্বনকে লাগাবে নিজেদের কাজে আর অক্সিজেন ছেড়ে দেবে বাতাসের মধ্যে। তখন খাও দাও থাক ; আর জায়গার জন্যে মারামারি করতে হবে না।

পণ্ডিতেরা কি বলেন জান? আমাদের এই পৃথিবীটাও এককালে শুক্রের মতই ছিল। আসলে পৃথিবীর এই দুই পাশের এই দুইটি গ্রহ্ এর অতীতের আর ভবিষ্যতের রূপ বর্ণনা করছে। শুক্র হ'ল পৃথিবী পূর্ব্বে যেমন ছিল আর মঙ্গল হ'ল এ পরে যা হবে। আমাদের এ পৃথিবীটা যে অতীতে খুবই গরম ছিল, সে ত তোমরা আগেই জেনেছ। হয়ত কিছুদিন আগে এ শুক্রের মতই গরম ছিল—একবারেই ত আর এখনকার মত ঠাণ্ডা হতে পারে নি। অবশ্য সে কতদিন আগে বলা যায় না। কিন্তু এখানে লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে যে নানা রকম জীবজন্তু ছিল তার সংবাদ আজকাল অনেক পাওয়া যাচ্ছে। সে সব জীবজন্তুর অনেকগুলোরই কোন নিদর্শনও এখন নেই। তারা মরে গেছে, তাদের বংশ একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। এমন সব অদ্ভুত তাদের আকার যে দেখলে এখন হাসি পায়। অথচ এরা যে এখানে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পণ্ডিতেরা কি বলেন জান,—এই যে আমরা এখন মানুষ আর অন্যান্য সব জীবজন্তু দেখতে পাচ্ছি এদের সব্বাই আগে

থেকেই এখানে ছিল না। মানুষ ত ধরতে গেলে সেদিনকার মাত্র। সূর্য্যের থেকে ছুটে আসবার পর এ পর্য্যন্ত কত দিন গিয়েছে—পৃথিবীর বয়স কত তা নিয়ে পণ্ডিতেরা নানা জল্পনা-কল্পনা করছেন। তাঁদের মতে এর বয়স হ'ল দেড়শ' থেকে সাড়ে তিনশ' কোটি বৎসরের মধ্যে। ধরা যাক দু'শ কোটি বৎসর, অর্থাৎ এই দু'শ কোটি বৎসর আগে একদিন পৃথিবী সূর্য্য থেকে ছুটে এসে এখন যে জায়গায় রয়েছে সেই জায়গায় উপস্থিত হয়ে ঘোরা-ফেরা সুরু করে। তখন যে এ ভীষণ গরম ছিল সে ত তোমরা এমনি বুঝতে পার; তারপর আস্তে আস্তে এ ঠাণ্ডা হয়েছে, আস্তে আস্তে এর মধ্যে জীবজন্তুর আবির্ভাব হয়েছে।

যাক—এই দু'শ কোটি বৎসর কল্পনা করাও এক অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয় না কি? লিখলে কতগুলো শূন্যের দেখা পাওয়া যাবে। তোমরা অন্যভাবে এর কতকটা আন্দাজ করতে পার। ধর, তুমি পৃথিবীর আদি জন্ম থেকে সুরু করে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত একটা ইতিহাস লিখেছ। সে বই-এর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আছে ৩০ লাইন, প্রত্যেক লাইনে ১০টি করে শব্দ আর প্রত্যেক শব্দে আছে ৬টি করে অক্ষর। এই বই-এর একটি অক্ষরও যদি এক হাজার বৎসরের ইতিহাসের জন্য ব্যয় কর, তা'হলে সমস্ত ইতিহাসটা ১০০০ এক হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হবে। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা

কেমন! তোমরা ত এখন ইতিহাস পড়তে পড়তে হয়রান হয়ে যাও। এই ভারতবর্ষের ইতিহাস—সেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে এই ইংরেজ রাজত্ব পর্য্যন্ত কত রাজা, কত বাদশাহ, কত বংশই যে রাজত্ব করেছে, বড় হয়েছে আবার লোপ পেয়েছে! একদিন যাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবী কাঁপত এখন তাদের খোঁজ-খবরই পাওয়া যায় না—এদের নাম মুখস্থ রাখতে ত তোমরা হিমসিম খেয়ে যাও—আমাদের এই হাজার পৃষ্ঠার বইয়ের পৃথিবীর ইতিহাসে তোমাদের এই এত বড় ইতিহাস কয় পৃষ্ঠা জুড়ে হবে বলতে পার? এটা থাকবে সেই বইয়ের শেষের পৃষ্ঠার শেষ লাইনের শেষের দুই অক্ষরে। তা'হলেই দেখছ আমরা এই দুই অক্ষরের কথাটাই কিছু কিছু জানি আর এই যে হাজার পৃষ্ঠার বিরাট বই এ আমাদের একেবারে অজ্ঞাত।

বৈজ্ঞানিকেরা এর কিছু কিছু আবিষ্কার করেছেন নানা উপায়ে, সে তোমরা বড় হলে আরও ভাল করে বুঝতে পারবে। এই ৫০ কোটি বৎসর আগের কথা তাঁরা কিছু কিছু বলতে পারছেন। তখন পৃথিবীটা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে—জমা জলটলগুলো একটু একটু শুকুতে সুরু করেছে, তবে অনেকটা কাদা কাদা আছে; এই ঠিক আশ্বিন মাসের প্রথমে আমাদের বিলপ্রধান দেশে যেমন হয় আর কি! তখন দেখা দেয় সবচেয়ে নিম্নস্তরের জীব—কেঁচো, জেলি প্রভৃতি জীবের মত।

এরাই হ'ল পৃথিবীর আদিম অধিবাসী। তারপর কোটি কোটি বৎসর চলে গেল, আস্তে আস্তে সামুদ্রিক গাছপালার মত গাছপালার জন্ম হ'ল—এগুলো অবশ্য ঠিক গাছের মত নয় বরং অনেকটা মাছ জাতীয় প্রাণী সমুদ্রের নীচে যেন দেখা যায়। তার পর নানা রকমের ঘাস, গাছপালা, নানা রকম জীবজন্তুর আবির্ভাব সুরু হ'ল—কারুর পিঠে ছিল কচ্ছপের মত শক্ত খোল, কারুর বা খোলের উপর শিংএর মত শক্ত শক্ত হাড় নানা রকমের, নানা আকারের। পৃথিবীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর আবহাওয়ারও পরিবর্ত্তন সুরু হ'ল; সেই অনুসারে এর জীবজন্তুরও পরিবর্ত্তন সুরু হ'ল। যারা এই নূতন আবহাওয়ায় খাপ খাইয়ে চলতে পারল তারা গেল বেঁচে, যারা পারল না তারা হয়ে গেল ধ্বংস—তাদের আর কোন চিহ্ন রইল না। এই রকম পৃথিবীতে চলেছে ধ্বংস আর সৃষ্টির মহড়া।

তোমরা হয়ত ধ্বংস আর সৃষ্টির কথাটা ভাল বুঝতে পারছ না। ধর, এক কোটি বৎসর আগের কথা। তখন পৃথিবী এর চেয়ে অনেক গরম ছিল—এর নিজের ভিতরেও অনেক তাপ ছিল—সূর্য্যের তাপও এখনকার চেয়ে অনেকটা বেশী পেত। তখনকার যে সব জীবজন্তু তারাও ছিল এই গরমের উপযোগী। তারা শীতের আমেজও পেত না, তাদের গায়েও শীত নিবারণের জন্য লোমের দরকার ছিল

না। এর ৫০ লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবী আগের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, শীতের আমেজও পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ব্বের যে সব জীবজন্তু তাদের ত আর লোম নেই কিংবা শীতের হাত থেকে বাঁচতে পারে তেমন উপায় করবার বুদ্ধিও নেই, তখন এদের এমনি নিরুপায় হয়ে মরতে হবে। এই সময় শীত থেকে বাঁচতে পারে এমনি লোমশ জন্তুরই সৃষ্টি হয়েছে। এমনি ভাবেই চলছে। তার চেয়ে ৫০ লক্ষ বৎসর পরে আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আরও শীত পড়ছে। পূর্ব্বেকার অল্প শীতে যে লোমে চলত এখন আর সে লোমে চলছে না—তাই অল্প লোমওয়ালারা মরে যায়, তার চেয়ে বেশী লোমওয়ালার সৃষ্টি হয়।

শুক্রের কথাও এর সঙ্গে তুলনা করা যাক্। শুক্রের যেমন অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তাতে তারও এই অবস্থাই চলছে। হয়ত সেখানেও এই ধ্বংস আর সৃষ্টির ব্যাপারেরই হাতসাফাই চলছে। এখন হয়ত তোমরা সেখানে পৃথিবীর আদিম অধিবাসী কেঁচো, জেলি ফিসের মত জিনিসই দেখবে। তারপর এ আস্তে আস্তে আরও ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে এই সৃষ্টিরও পরিবর্ত্তন চলবে।

এতে এখনও যে মানুষের মত উচ্চস্তরের জীবের আর্বিভাব হয় নি আর একটা ব্যাপার থেকেও তা অনুমান করা যেতে পারে। আমরা দেখেছি এখানে একদিকে প্রায় সব সময়েই

রোদ আছে, আর একদিকে তার বিশেষ নামগন্ধ নেই। তার অর্থই হচ্ছে এর একদিকে রয়েছে উষ্ণমণ্ডল—খুবই গরম, আর অন্য দিকে শীতমণ্ডল—খুবই শীত। খুব গরমও নয়, খুব শীতও নয় এমন মাঝামাঝিটা না হলে মানুষ বাঁচতে পারে না—মানুষের মত জীব খুব শীতেও যেমন থাকতে পারে না, খুব গরমেও তেমনি তাদের বাস করা সম্ভবপর নয়।

তোমরা হয়ত ভাবছ তা'হলে আর এখন এত কষ্ট করে শুক্রে যেয়ে লাভ কি? আরও কিছুদিন যাক্, তখন দেখা যাবে। কথাটা অবশ্যি মন্দ নয়, তবে তোমাদের এই আলসেমির জন্য অন্য কেউ আগে যেয়ে সব জেনেশুনে এসে টেক্কা না দেয়! তা'হলে আর বাহাদুরী পাওয়া যাবে না, পস্তাতে হবে। আর তা ছাড়া যেতে পারলে বিশেষ ক্ষতিও ত নেই, বরং এখনকার মত কিছু জায়গা দখল করে রাখতে পারলে পরে বেশ লাভবান হতে পারবে। আপাততঃ এই ধারণা নিয়েই সন্তুষ্টচিত্তে যাত্রা সুরু করে দাও।

সমাপ্ত